লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি

আবু জাফর শামসুদ্দীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি

আবু জাফর শামসুদ্দীন

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার
প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৯৫, আগস্ট ১৯৮৮

মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা. ১০০০
মুদ্রক : নাজমুল হক, মডার্ণ টাইপ ফাউন্ডার্স প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ
২৪৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের
অগ্রপথিক কবি আবদুল কাদিরকে
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চী প ত্র

বাঙালীর সমন্বিত লোক-সংস্কৃতি ৯
সমাজবিজ্ঞান ও বাঙালী সমাজ ৬২
ইহজাগতিকতা ৮৩
সবার উপরে মানুষ সত্য ১১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব-কথা

১৯২৬ সাল। আমি ঢাকায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র—
বয়স চৌদ্দ। তৎকালীন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নীচের
তলার হলঘরে অনুষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্বো-
ধনী অধিবেশনে রবাহুত আগন্তুক হিসেবে উপস্থিত
ছিলাম। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র,
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ছিলেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধ্যাপক। আমি বালক। ওদের কারো সঙ্গে
যোগাযোগ ছিল না। দ্বার উন্মুক্ত ছিল, তাই প্রবেশ করে-
ছিলাম। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্ররূপে "শিখা"
প্রকাশিত হয়। "বুদ্ধির মুক্তি" ছিল "শিখার"
লক্ষ্যাদর্শ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তখন
বুদ্ধিকে মুক্ত করার উপযোগী কবিতা ও গান রচনা
করছিলেন। তাঁর কিছু কিছু রচনা তখন পাঠ
করেছি। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণাপুরুষ ছিলেন
কাজী নজরুল ইসলাম। সম্ভবতঃ তাঁর রচনার
সঙ্গে কিছুটা পরিচিত থাকার কারণেই "বুদ্ধির মুক্তি"র
বিষয়টি আলোচনার্থে অনুষ্ঠিত ঐ-সভা আমার
অপরিণত মন মানসে রোমান্টিক শিহরণ
জাগিয়েছিল। পরে শিখা গোষ্ঠীর প্রায় সকলের সঙ্গেই
পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়। অধ্যাপক কাজী আবদুল
ওদুদ ছিলেন ঢাকা কলেজে আমার শিক্ষক।
শিখাগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ কবি আবদুল কাদিরের সঙ্গে বিশেষ
ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি আজীবন মুক্তবুদ্ধির চর্চা
করেছেন। আমাকে নানা কুসংস্কার এবং অন্ধ-
বিশ্বাসের প্রাচীর ঘেরা অতীতের মোহ হতে মুক্ত করার
ব্যাপারে কবি আবদুল কাদির অগ্রজের কর্তব্য পালন
করেছিলেন। এই গ্রন্থে চারটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।
প্রথম প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমী আয়োজিত
"বক্তৃতামালা" সিরিজের একটি এবং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত
সুধীজন সমাবেশে পঠিত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং
চতুর্থ প্রবন্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণীজন সমাবেশে যথাক্রমে নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতা, সাইদুর রহমান ফাউণ্ডেশন বক্তৃতা এবং গোবিন্দ দেব স্মারক বক্তৃতারূপে উপস্থাপিত হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ আমার হয় নি। স্বোপার্জিত সামান্য বিদ্যা সম্বল করে বিষয়বস্তুগুলিকে মুক্তবুদ্ধির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। ঐতিহাসিক ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত বইপুস্তক হতে আহৃত: মতামত আমার নিজের। গুণাগুণ বিচার করবেন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক। বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত কেউ সম্ভবত আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁদের সকলের মহান স্মৃতি আমার বাকী জীবনের পাথেয় হয়ে রইল। পরি-শেষে যে সব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ও প্রেরণায় প্রবন্ধগুলি রচিত হয় তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী অনুজপ্রতিম মফিদুল হককে।

আবু জাফর শামসুদ্দীন
ঢাকা ৪ ভাদ্র, ১৩৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালীর সমন্বিত লোক-সংস্কৃতি

•

এক শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে Mathew Arnold ধর্ম এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "Religion says : The Kingdom of God is within you ; and culture, in like manner, places human perfection in an internal condition, in the growth and predominance of our humanity proper, as distinguished from our animality. It places it in the ever-increasing efficacy and in the general harmonious expansion of those gifts of thought and feeling, which make the peculiar dignity, wealth and happiness of human nature. As I have said on former occasion : 'It is in making endless additions to itself, in the endless expansion of its powers, in endless growth in wisdom and beauty, that the spirit of human race finds its ideal. To reach this ideal, culture is an indispensable aid, and that is the true value of culture.' Not a having and a resting, but a growing and a becoming, is the character of perfection as culture conceives it ; and here, too, it coincides with religion."

সংস্কৃতি ও সভ্যতা শব্দদ্বয় সাধারণতঃ একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতিবান লোককে আমরা সভ্য লোক বলেও মনে করি। তা সত্ত্বেও ওদের অভিন্ন বস্তু না বলে পরস্পরের পরিপূরক বলাই ঠিক। সভ্যতার লিখিত ইতিহাস আছে, আছে ইন্দ্রিয়গম্য বহু নিদর্শন। কিন্তু মানবজাতির লিখিত ইতিহাসের চেয়ে তার অলিখিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা-সংখ্যা অনেক বেশি। আদিকালের সে সব পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ একটি বইয়ের ভূমিকায় এক ইরানী কবির দু'টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে আছে, পৃথিবী এমন একটি গ্রন্থ যার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। পর্বতগুহায় এবং মৃত্তিকা খনন করতে গিয়ে প্রাপ্ত প্রাচীন লোকবসতির নিদর্শন সমূহের সাহায্যে বিলুপ্ত ইতিহাসের সে-সব পৃষ্ঠা যতদূর সম্ভব রচনার চেষ্টা চলছে। কিন্তু লাখ লাখ বছরের বিলুপ্ত অধ্যায়গুলোকে এ-ভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপদান সম্ভব নয়। লিখিত ইতিহাসের বাহন ভাষা। বহু ভাষা লোপ পেয়েছে। এবং মানবজাতির ইতিহাসে ভাষার জন্মও খুব বেশি দিনের নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির উদ্ভব, তার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ইতিহাস। সুতরাং সংস্কৃতির শুরু কবে থেকে আমরা তা জানি না। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শন, লিখিত ইতিহাসে পরিবেশিত তথ্য প্রভৃতি হতে আমরা সংস্কৃতির ক্রমান্বয়িক রূপান্তর সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। স্মৃতিশক্তি মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি। স্মৃতি নানাভাবে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। মানবজাতি স্থবির বসে নেই, এগিয়ে চলছে। কিন্তু নিত্য জঙ্গমতার মধ্যেও মানুষ সুদূর অতীতের বহু স্মৃতি মস্তিষ্কে বহন করছে। কৃষিযুগে এমন কি যন্ত্রযুগে প্রবেশ করেও মানুষ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে--নিছক আমোদের জন্যে শিকারে যায়। অর্থাৎ সে প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনযাত্রা প্রণালীর স্মৃতি কতকটা যেন স্বভাবজাত বৃত্তিরূপে বহন করে চলছে। এ-যুগের লিখিত ইতিহাসে এই স্ববিরোধের বিবরণ পাওয়া যাবে না ; কেননা এগুলো উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। কিন্তু এগুলোও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত বিষয়। নগর-সংস্কৃতি এবং লোক-সংস্কৃতির পার্থক্য নির্ণয় সহজ কিন্তু ঐ যে দুটো অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলাম, ঐ অভ্যাস দুটোর দাস শহরবাসীও। শুধু বাংলার ন্যায় অনুন্নত দেশের নগরবাসী নয়। ইয়োরোপ আমেরিকার অত্যাধুনিক দেশের নগরবাসীরাও নারীজাতিকে সর্বক্ষেত্রে সমান মর্যাদা দেয় না : ঘরের স্ত্রীকে মারধরও করে।

আমার বক্তব্য ঃ জনজীবনকে কেন্দ্র করেই মানব-সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সুতরাং লোক-সংস্কৃতিকে মহত্তর এবং বৃহত্তর মানব-সংস্কৃতি হতে পৃথক করে বিবেচনা করা যায় না। কেননা জনজীবন সংযোগহীন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। নানা কারণে মানব-সমাজের কিছু কিছু অংশ কোনো এক সুদূর অতীতে বৃহত্তর মূল বাসস্থান হতে হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অথবা এও হয়তো বলা যায়, বিচ্ছিন্নভাবেই তাদের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু পন্ডিতদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য হতে জানা যায় যে, অতীতের অলিখিত ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে সমগ্র মানবজাতি অভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তরে অবস্থান করত। সেই আদিম স্তরের কিছু কিছু স্মৃতি এ যুগের সভ্য মানুষও বহন করে চলছে। টটেম ও ট্যাবু অবিকল সে-ভাবে না থাকলেও প্রচ্ছন্নভাবে আছে। যে-কারণেই হোক, মানব সমাজের যে ক্ষুদ্র অংশ আজও প্রাগৈতিহাসিক যুগে পড়ে আছে তারা বিরল ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে। উন্নত মানব সমাজেও কিছু কিছু বিকলাঙ্গ দৃষ্ট হয়। ওরা সমাজের প্রতিনিধি নয়। বিরল ব্যতিক্রমদের বাদ দিলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৃহত্তর মানবজাতির অগ্রগতি অব্যাহত আছে। কিন্তু একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। দুঃশাসনের ফলে দেশ-বাসীর দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়লে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং শাসন পদ্ধতি পরিবর্তন করা যায়। এটাকে আমরা বিপ্লব বলি। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লব হয় না। সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুকে সেই মুহূর্তে টেনে লম্বা এবং জ্ঞানবৃদ্ধ করতে চাইলে তার মৃত্যু অনিবার্য। স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে সে বড় হয়ে ওঠে। বৃদ্ধির প্রান্তসীমায় পৌঁছে সে মরে। ব্যক্তি মানুষের এই মৃত্যুর সঙ্গেও সংস্কৃতি তুলনীয় নয়। জীবন তার প্রবহমানতা রক্ষা করছে। জীবনের প্রবহমানতার মতো সংস্কৃতিও একটি প্রবহমানতা। তাই, সংস্কৃতির ওপর গায়ের জোর প্রয়োগ করলে ফলাফল ভালো হয় না। আমাদের কালে তার দৃষ্টান্ত চীন এবং পাকিস্তান। সংস্কৃতি সঙ্ নয়। সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে ধীরে সুস্থে। সংস্কৃতির বাহন অশ্বের যুগেও যেমন অশ্ব ছিল না তেমনি বিমানের যুগেও বিমান নয়। পায়ে হেঁটে যে দূরত্ব অতিক্রম করা যায় তার মধ্যে আকস্মিকতার চমক নেই; কিন্তু দূরত্ব অতিক্রম করা হয় ঠিকই। এ যুগে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অচিন্তনীয় উন্নতির ফলে অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটছে। স্থানিক বৈশিষ্ট্য ও দূরত্ব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্ব-সংস্কৃতি নির্মাণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানবজাতি। ম্যাথ্যু আর্নল্ডের উক্তির তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই। আমার মূল বক্তব্য উপস্থাপনের পূর্বে সংক্ষিপ্ত এ-ভূমিকাটুকু দেয়া প্রয়োজন মনে করছি।

সূচনা

বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল বিশাল উপমহাদেশীয় সমতলভূমির অংশ। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (পাখতুনিস্তান) হতে এই সমতলভূমির শুরু, শেষ হয়েছে চট্টগ্রামে গিয়ে। উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল ও বঙ্গোপসাগর। প্রাচীনকাল হতেই বর্তমান বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় সমতলভূমির বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক এবং কখনও কখনও রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিল। যোগিনীতন্ত্রের শ্লোক "পূর্বে স্বর্ণনদী যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে/দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচল ঃ অষ্টকোণং চ সৌমারং যত্র ডিক্করবাসিনী।" অর্থাৎ "ডিক্করবাসিনীর পীঠস্থান হচ্ছে সেই অষ্টকোণাকৃতি সৌমার দেশে যার পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে স্বর্ণনদী, পশ্চিম সীমান্ত করতোয়া নদী, দক্ষিণে মন্দা পাহাড় ও উত্তরে বিহগাচল নামক পাহাড়।" শ্লোকটি উদ্ধৃত করে একজন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ বলছেন, "যে অঞ্চলটাকে এই শ্লোক ইঙ্গিত করছে সেটা হচ্ছে আসাম। সকলেরই জানা আছে যে, আসামের কামাখ্যা হচ্ছে শক্তি-ধর্মের পীঠস্থান। বস্তুতঃ আসাম ও বঙ্গদেশেই শক্তিধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটেছিল। সুমেরে শক্তিধর্মের প্রাবল্য, ও তাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী যে তারা পূর্ব দিকের কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমুদ্রপথে এসেছিল, তার দ্বারা কি বোঝায় তা বিচার্য।" অতঃপর উক্ত পণ্ডিত মন্তব্য করছেন, "মিশর, ক্রীট, সুমের, এশিয়া মাইনর, সিন্ধু উপত্যকা ও অন্যত্র যে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, খুব সম্ভবত সে সভ্যতার আদি জন্মস্থান পূর্ব-ভারতে এবং পশ্চিম বঙ্গের সামুদ্রিক বণিকরাই তার বীজ ও মাতৃকাদেবীর উপাসনা পৃথিবীর দূর দেশসমূহে নিয়ে গিয়েছিল। কেননা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় ঘটেছিল যেখানে প্রচুর পরিমাণ তামা পাওয়া যেত। ধলভূমে ভারতের অন্যতম বিরাট তাম্রখনির বিদ্যমানতা ও প্রাচীন বাংলার প্রধান বন্দরের তাম্রলিপ্তি নাম, সেই মতবাদকেই সমর্থন করে।"

"এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাচীনকালে বাঙালীরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ছিল। ওই অঞ্চলে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশের কথা আমরা পরবর্তীকালে মিশরবাসী এক নাবিক প্রণীত 'পেরি-প্লাস' গ্রন্থেও উল্লেখ পাই। ভেলেরিয়াস ফ্লাকাসও তার আরগনটিকা পুস্তকে লিখে গেছেন যে, গঙ্গা রাঢ়দেশের বাঙালী বীরেরা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ১৫০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দে (ঋগ্বেদ রচয়িতা নর্ডিক আর্যদের পঞ্চনদে এসে উপস্থিত হবার সমসাময়িককালে) কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরই প্রতিধ্বনি করে ভার্জিলও তার 'জর্জিকাস' নামক কাব্যে লিখে গেছেন যে, গঙ্গারাঢ়ের বাঙালী বীরদের শৌর্যবীর্যের কথা 'আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব'। যেহেতু তাম্রাশ্ম সভ্যতাই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সব চেয়ে বড় বিপ্লব ঘটিয়েছিল, সেহেতু এটা মনে করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশই সভ্যতার ইতিহাসে সংঘটিত এই বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল" (দ্রষ্টব্য: অতুল সুর: সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান, পৃঃ ২৪-২৫, জিজ্ঞাসা সংস্করণ, ১৯৮৩, কলকাতা)। যে যুগের কথা বলা হচ্ছে তখনও আধুনিক অর্থে বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়নি। অতুল সুর বর্তমান বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের কথাই বলছেন। বাঙ্গালাহ, বাংলা ও বাঙালী অনেক পরের ব্যাপার। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির সাহায্যে আমি এখানে একথাটাই বলতে চাই যে, বৈদিক যুগের আর্যগণ এ-অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে অসভ্য বর্বর অস্পৃশ্য মনে করলেও, বৈদিক কালেরও বহু পূর্ব হতে বর্তমান বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে শুধু উত্তর ভারতের বিশাল সমতলভূমির লোকজনের যোগসূত্র ছিল না, পৃথিবীর অন্য বহু স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গেও সম্ভবতঃ তাদের অল্প বিস্তর যোগাযোগ ছিল। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতিকে যেমন বিশাল উত্তর ভারতীয় সমতলভূমির সংস্কৃতি হতে পৃথক করে বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, তেমনি রাজা ও রাজ্যের উত্থান পতন এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় পড়ে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল বহুবার বিভক্ত হলেও কর্তিত স্বাধীন বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতিকে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতি হতে সম্পূর্ণ আলাদা করে বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করলে শুধু মারাত্মক ভুল করা হবে না, আমরা একটি উদ্বাস্তু জাতিতেও গণ্য হবো। ইয়োরোপেও অসংখ্য রকমের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট আছে। কিন্তু শতরকমের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বলতে আমরা একটা বিশেষ অঞ্চলের জীবনযাত্রা প্রণালী ও জীবন-বোধকে বুঝি। তেমনি আজকের বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতিও বৃহত্তর বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল তথা সমগ্র উত্তর ভারতের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্লীন থেকে তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করছে। বিভিন্ন জেলা এমন কি মহকুমা মহকুমায়ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। অসংখ্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই বৃহত্তর বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির ফল্গুধারাটি প্রবহমান।

জীবিকা

জীবিকার সঙ্গে শুধু লোক-সংস্কৃতি নয় উচ্চমার্গীয় নগর-সংস্কৃতিরও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবনযাত্রাপ্রণালী থেকেই সকল সংস্কৃতির উদ্ভব : জীবনযাত্রাপ্রণালী জীবনবোধ নির্মাতা। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র যমুনা পদ্মা মেঘনা এবং তাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিধৌত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের আপামর জনসাধারণ ঐতিহাসিক কাল হতে তো বটেই এমন কি সম্ভবত ঐতিহাসিকালেরও পূর্ব থেকে মূলতঃ কৃষিজীবী। বাংলা আসামের পার্বত্য ও বনাঞ্চলের জুম চাষপ্রথা সে প্রমাণই দেয়। আমাদের এ বাংলায় কৃষিজীবীর সংখ্যা এখনও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ। বৃটিশ আমলের পূর্বে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে কখনও বাণিজ্যিক ও শিল্পকেন্দ্ররূপে বিশাল নগর স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে নি। হিন্দু, বৌদ্ধ, তুর্ক, আফগান, মোগল আমলের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে কিছু সংখ্যক নগর স্থাপিত হয়েছিল সত্য কিন্তু সেগুলো ছিল ছাউনি ও রাজদরবার-কেন্দ্রিক। রাজার রাজ্যচ্যুতি অথবা রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। গৌড়, পুণ্ড্রবর্ধন, লক্ষ্মণাবতি, সোনারগাঁ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এখন ধ্বংসস্তূপ—ইতিহাসের পাতা তাদের এককালের গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্বের স্মৃতি বহন করছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকাও লোপ পেতে বসেছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজনীতি তাকে পুনর্জীবন দান করে। বঙ্গবিভাগ রদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার পর ইংরেজ সরকার ঢাকাকে বাংলার দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা দান করায় তার অস্তিত্ব রক্ষা পায়। বৃটিশ আমলেও বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের একমাত্র বৃহৎ নগর এবং শিল্পকেন্দ্র ছিল কলকাতা। ঢাকা-সহ আজকের বাংলাদেশের জেলা ও মহকুমা শহরগুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে কিঞ্চিৎ উন্নত ধরনের গ্রাম। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ব্যতীত বাকীগুলো এখনও প্রায় সে অবস্থায়ই আছে। শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরি প্রভৃতি নগরবাসীদের পেশা। নগর-সংস্কৃতি ও সভ্যতা ও-সব পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ-অঞ্চলে নগরই ছিল না। সুতরাং নগর-সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় সাধারণভাবে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে এবং বিশেষভাবে আজকের বাংলাদেশে তার প্রভাব আগেও ছিল অনুল্লেখযোগ্য, এখনও আমরা প্রায় ঐ অবস্থায়ই আছি। কিছু কিছু রূপান্তর ঘটছে সত্য কিন্তু নগর-সভ্যতা ও সংস্কৃতি পল্লীজীবনকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারে নি। কেননা, সংস্কৃতির সঙ্গে বৃত্তি অর্থাৎ পেশার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

নানাভাবে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত বাঙালীর ইতিহাস হতে আমরা জানতে পারি যে, কৃষি নির্ভর বাংলার আর্থ সামাজিক ভিতভূমি গ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। এক জোড়া বলদ এবং কাঠের লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষক খাদ্য উৎপাদন করতো। উত্তর ভারতের কোথাও কোথাও সেচ কার্যের জন্যে নির্মিত খালের ব্যবস্থা বহুকাল পূর্ব হতেই বিদ্যমান থাকলেও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষ প্রকৃতির সুমতি কুমতির উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। কাঠের দুনির সাহায্যে কিছু কিছু জলসেচ হতো হয়তো। কিন্তু ওটা চাষীর স্ব-উদ্ভাবিত ব্যবস্থা। একালেও দুনি এবং বাঁশবেতি নির্মিত সেচনী ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে নির্মিত সেচখাল অথবা বন্যার জল নিষ্কাশনের কোনো প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার একটি নিদর্শনও বাংলাদেশে পাওয়া যায় নি বলেই জানি। প্রাকৃতিক আনুকূল্য প্রতিকূল্যকে নিয়তির বিধানরূপে মেনে নিয়ে আবহমান কাল হতে বাংলার চাষী আপন প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে শস্য উৎপাদন করতো। ইণ্ডাস্ট্রি রূপে অর্থাৎ বিদেশে এমন কি বাংলার সীমাসংলগ্ন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে শস্য রপ্তানি করার জন্যেও বৃহদায়তনের কৃষি তৎপরতা বাংলায় কখনও ছিল বলে মনে হয় না। মসলিন বস্ত্রের ন্যায় কিছু কিছু বিলাসদ্রব্য অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে রপ্তানি শুরু হয় জলপথে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার পর। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম নির্বিশেষে সব শাসনামলেই রাজা বাদশাহ (আধুনিক ভাষায় সরকার) ছিলেন ভূমির অবিসংবাদিত মালিক। রাজা বাদশাহরা অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের ভূমিদান করতেন। এ-ভাবে মুসলিম আগমনের পূর্বেই ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। মধ্যযুগের রাশিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো ভূমির সঙ্গে ভিটা অর্থাৎ চাষী হস্তান্তরের দৃষ্টান্তও আছে। তা সত্ত্বেও মনে হয়, রাজা বাদশাহ বা সামন্তকে দেয় ভাগ নিয়মিতভাবে আদায় করলে চাষী সম্ভবতঃ পুরুষানুক্রমে তার কর্ষিত জমি ভোগ করতে পারত। হিন্দু বৌদ্ধ আমলে স্থানীয় জনসাধারণকে নোটিশ দিয়ে ব্রাহ্মণ এবং সরকারী আমলাদেরকে ভূমিদান করার দলিল পাওয়া গেছে। এতে মনে হয়, চাষীদেরকে বাস্তুভিটা ও কর্ষিত জমি হতে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু দান গ্রহণ-কারীরা স্বহস্তে জমি চাষ না করলে চাষী হয়তো উচ্ছিন্ন হতো না। অপর দিকে কামার, কুমোর, ছুতোর, স্বর্ণকার, কলু, ধাই, ধোপা, নাপিত, জেলে, জোলা, ডোম, চর্মকার, কাসারী, গোয়ালা, শিল্পী, পুরোহিত, বাদ্যকর, জাদুকর, চিকিৎসক, কথক প্রভৃতি শ্রেণীর হুনরমন্দ (Technician) গ্রামেই বসবাস করতো। কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক জীবনে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য-আবশ্যক সে-সব দ্রব্যাদি গ্রামবাসী কারিগরেরা গ্রামবাসীদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে তৈরী করতো। এখন হতে ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে বাল্যকালে আমি নিজেই এরূপ স্বনির্ভর জনপদ দেখেছি। পুরোহিত, জাদুকর বাদ্যকর, গায়ক, কবি, গায়েন, কথক এবং শিল্পীরা গ্রামবাসীদের আত্মিক এবং সাংস্কৃতিক আর্তি পূরণ করতেন। সংক্ষেপে এই ছিল স্বনির্ভর গ্রামের সামাজিক জীবন। রাজ-রাজড়ার উত্থান-পতন, রাজ্যের সীমা সংকোচন পরিবর্ধন পরিবর্তন দ্বারা পল্লী বাংলার সমাজ জীবনে গুরুতর আলোড়ন সৃষ্টি করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিরাজউদ্দৌলা বনাম ক্লাইবের রণে দেশের স্বাধীনতা সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে তখন পলাশির অনতিদূরের বাংলার চাষীরা যথারীতি জমি চাষ করছিল। দেশ দখল করার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকজন গ্রামগঞ্জে অবাধ লুটপাট শুরু করলে পল্লী বাংলার চাষীরা স্থানে স্থানে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে শুরু করে। কিন্তু বাংলার চাষী কোনো গৃহযুদ্ধে যোগ দেয়নি। রাজ রাজড়ারা ভাড়াটে সেনাবাহিনী (Mercenary Army) দিয়ে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে পল্লীবাসীদের মধ্যে একটা সাধারণ সমঝোতা ছিল বলে মনে হয়। প্রথমতঃ ধর্ম বিশ্বাসকে ওরা ওদের প্রাচীন ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিয়েছে। ধর্মীয় বিভেদ বা মতানৈক্য লাঠালাঠিতে পরিণত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ওদের সামান্য ধন ও অধিকারের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করলে কখনও কখনও সংঘবদ্ধভাবেই রুখে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ আমলে ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, প্রভৃতি তার সাম্প্রতিককালীন দৃষ্টান্ত। পাঠান আমলে মোহাম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের দোয়াব অঞ্চলের চাষীরা বিদ্রোহ করেছিল। ভৌগো-লিক পরিবেশ মানব চরিত্রের উপর বিশেষভাবে প্রভাবশীল হয়। বাংলাদেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়টি ঋতু। প্রতিটি ঋতু মাত্র দু'মাস স্থায়ী। চরম আবহাওয়া এখানে নেই, উৎপাদন পদ্ধতি এক। আবহাওয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতার পটভূমি। বাংলার লোক-সংস্কৃতির চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাভাষাভাষীর মন ও মানস গঠনে তার ভূমিকা বুঝতে হলে উক্ত বিষয়গুলো স্মরণ রাখা আবশ্যক।

লোক-সংস্কৃতির উপাদান

ভূমিকায় বলেছি, একসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হলেও সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক বস্তু নয়। সংস্কৃতির মধ্যে মানবেতিহাসের প্রায় সব কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কার ও সংশোধন সত্ত্বেও সংস্কৃতি প্রাগৈতিহাসিক কালের বহু আচার আচরণের প্রতীক ধারণ করে আছে। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নতুন এবং পরিশোধিত। সংস্কৃতির মধ্যে মেকি জিনিস অর্থাৎ মুখোশ বিরল ঃ সংস্কৃতি বনজ ফুল ঃ সভ্যতা কেয়ারিতে সযত্নে লালিত পুষ্প। বাঙালী নারী নদীর ঘাটে যায়। সেখানে মাথা ডুবিয়ে স্নান করে আর্দ্র বস্ত্রে আর্দ্র কেশে কলসি কাঁখে গৃহে ফিরে আসে। এটা আবহমানকাল হতে চলে আসছে। নদীবহুল বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করার জন্যেই যেন এই আসা যাওয়া। শহরের পাকা বাড়ীতে বদ্ধ গোসলখানায় নগ্ন দেহে ফোয়ারার জলে সাবান মেখে গোসল করে ফিরে এসে মুখে পাউডার এবং ওষ্ঠে রঙ মেখে ফিটফাট ফুরফুর ঘোরাফেরার নাম সভ্যতা। প্রথম দৃশ্য চারণ কবিকে মুগ্ধ করে ঃ দ্বিতীয় দৃশ্য আধুনিক কবিকে প্রলুব্ধ করে। আমরা যাদের বর্বর বলি তাদেরও সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতি সংঘবদ্ধ মানুষের জীবনবোধ : সমাজ গঠনের মূল উপাদানগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ শীর্ষ-স্থানীয়। বিভিন্ন, এমন কি আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী উপাদানও লোক-সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে তার গঠন চলছে। আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে লোক-সংস্কৃতিও অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। ঝগড়া বিবাদ না করে সংঘর্ষে না গিয়ে অলক্ষ্যে মানিয়ে নেয়াকেই সংস্কৃতির রূপান্তর বলা হয়। লোক-সংস্কৃতি কেন, কোনো সংস্কৃতিই রাজনৈতিক বিপ্লবের ন্যায় আকস্মিকভাবে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে না। যুগ যুগ সঞ্চিত অভ্যাস মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়। মানুষ অভ্যাস ও জৈবধর্মকে প্রায়শঃ অভিন্ন জ্ঞান করে। তাই প্রচণ্ড আঘাতেও সামাজিক প্রথাপদ্ধতির শিকড় উৎপাটিত হতে চায় না। যথাস্থানে এ বিষয় আলোচিত হবে।

লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করছি :
১. আত্মরক্ষার স্বভাবজাত তাগিদ-প্রসূত হিরোইজম বা বীরত্ব—বীররস;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. প্রজাতি রক্ষার ধর্ম প্রসূত স্নেহ মায়া মমতা প্রেম ভক্তি বাৎসল্য আদিরস ইত্যাদি ; ৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, ব্যাধি এবং মৃত্যুভয় প্রভৃতি হতে উদ্ভূত নানা ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস ; ৪. প্রতিকূল প্রকৃতি ও সর্বপ্রকার শরীরী অশরীরী শত্রু বশীভূত অথবা বিতাড়নের ইচ্ছাপ্রসূত নানা জাদুমন্ত্র, টোটকা, তাবিজ ইত্যাদি যা পরবর্তীকালে সুসংবদ্ধ ধর্মপদ্ধতি সৃজনের সহায়ক হয়েছে ; ৫. শীত গ্রীষ্ম শিলাবৃষ্টি ঝড় তুফান এবং হিংস্র পশুর আক্রমণ হতে বাঁচার জন্যে নির্মিত বাসগৃহ ; ৬. লজ্জা নিবারণ, শীত তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং সাজ-সজ্জার আবশ্যকতাবোধ হতে আবিষ্কৃত পোশাক পরিচ্ছদ, প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতি ; ৭. সর্বোপরি জীবিকার্জন পদ্ধতি ও পন্থা। এগুলোকে সংস্কৃতির ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অবকাঠামো বলা যায়। ভাষা সাহিত্য শিল্প, নৃত্য গীতবাদ্য, সুসংবদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাস, সামাজিক বিধিবিধান প্রভৃতির সমন্বয়ে সংস্কৃতির সুপারস্ট্রাকচার বা অধিকাঠামো গঠিত। তৈজসপত্র, গৃহের আসবাব, বাদ্যযন্ত্র, নানাবিধ যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি উপর্যুক্ত বিভিন্ন উপাদানের পরিপূরকরূপে অধিকাঠামোতে বিদ্যমান।

বাংলার লোক-সংস্কৃতির রূপরেখা

বর্তমান বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির আদিরূপ কি ছিল তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করা কঠিন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা না কি দ্রাবিড়, মংগোল, আদি অস্ট্রিক প্রভৃতি বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর লোক ছিলেন। অনুমান ১৫০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে আর্য নামে পরিচিত নৃগোষ্ঠীর লোক পশ্চিম দিক হতে সর্ব-প্রথম উপমহাদেশে প্রবেশ করেন। তার আগেও এ-অঞ্চলে লোক বসতি ছিল এবং তারা নিশ্চয়ই এক বা একাধিক ভাষায় কথাবার্তা বলতেন—ভাববিনিময় করতেন। সেকালের ভাষা আজ লুপ্ত। কোনো নিদর্শন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। "পাল সম্রাটদের আমলে ১০৭২ সালের কৈবর্ত বিদ্রোহের সময়ে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ ও বিহার প্রায় দশটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এই রাজ্যগুলো নামে মাত্র পাল সম্রাটদের অধীনতা স্বীকার করত।" (রামশরণ-শর্মা, ভারতে সামন্ততন্ত্র, বঙ্গানুবাদ শিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ১৩০)। অভিধানে কৈবর্তদের "নিষাদের ঔরসে অয়োগবীজাত জাতি বিশেষ—দাশ জাতি" বলা হয়েছে। সুতরাং কৈবর্তরাও এ-দেশের আদিবাসী ; আর্যরা ওদের শুধু ধীবর দাস নয় প্রকৃতই দাসে পরিণত করেছিল বলেই হয়তো ওরা বিদ্রোহ করেছিলেন। এই কৈবর্ত জাতি ১০৭৫ খৃস্টাব্দে বা তার আগে পরে অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় ভাব বিনিময় করতেন না। ইচ্ছে করলেও ওদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাবার্তা বলা সম্ভব ছিল না ; কেননা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা দূরের কথা ঐ ভাষা শ্রবণ করাও ইতর জনের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ১০৭৫ খৃস্টাব্দে ওরা কি ভাষায় কথাবার্তা বলতেন আমরা তা জানি না। কৈবর্ত সমাজ এখনও আছেন। কালক্রমে ওদের দাসত্ববোধ কত গভীর হয়েছিল তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমি তখন বালক। মাছ কেনার জন্যে মেছোহাটায় গেছি। একজন কৈবর্তের খারিতে (বাঁশ বেতি নির্মিত মাছ রাখার পাত্র) বড় বড় কই মাছ। গ্রাহকের ভিড় দেখে কৈবর্ত চড়া দাম হাঁকছে। তৎকালে আমাদের গ্রামের বয়স্ক ব্রাহ্মণগণ গ্রীষ্মকালে গায়ে জামা পরতেন না। উদোম গায়ে পইতে ঝুলিয়ে হাট বাজার করতেন। হঠাৎ দেখলাম, জনৈক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ঐ কৈবর্তের মাথার ওপরে তাঁর পা তুলে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, মাছগুলো আমার ডুলায় তুলে দে। কৈবর্ত বিনা প্রতিবাদে মাছগুলো ঐ ব্রাহ্মণের ডুলায় তুলে দিল। ব্রাহ্মণ দাম দিয়েছিলেন কিনা মনে নেই; দিলেও বাজারদর অপেক্ষা কমই দিয়ে থাকবেন। রবি ঠাকুরের 'পুরাতন ভৃত্য' আমার এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আগে রচিত হয়েছিল কি পরে, তা' বলতে পারব না। তবে উক্ত কৈবর্তের ন্যায় পুরাতন ভৃত্যের যে দাসত্ব বোধটাও ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কথা বলছিলাম। পাল সম্রাটের বিরুদ্ধে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে, ঐরূপ একটি বিদ্রোহ সংগঠিত করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি এবং সাংগঠনিক দক্ষতা ওদের ছিল। সুতরাং বলা যায় যে, ওদেরও একটা স্বাধীন সাংস্কৃতিক জীবন ছিল। আজ সেটা চতুর্বর্ণীয় হিন্দু সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। আরো একটি প্রশ্ন ওঠে। বাংলাদেশের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ গভীর বন, টেকটিলা, অনুচ্চ পার্বত্য ভূমিতে যে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ এখনও অল্প বিস্তর দৃষ্ট হয়—যারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও—আলোকিত সমাজের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছে তারাই কি বাংলার উর্বর সমতল ভূমির আদিমতম অধিবাসী ছিলেন? একালের বাঙালীর চেহারা সুরত গায়ের রং গঠন প্রভৃতি দেখে মনে হয় অনার্য, আর্য, সেমীয়, মংগোলীয়, হাবশী, দ্রাবিড় প্রভৃতি বহু নৃগোষ্ঠীর মিশ্রণে বাঙালী জাতি গঠিত। ওরা সবাই যার যার আদিম সাংস্কৃতিক জীবনের স্মৃতি এবং কিছু কিছু অবশেষ—এমন কি আদিকালে প্রচলিত এক বা একাধিক আঞ্চলিক বোলের (ভাষা) কিছু কিছু শব্দ সহ ঐতিহাসিক কালের বাঙালী সমাজের মধ্যে মিশে গেছে। ঢাকা জেলার উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত একটি শব্দ 'বাংগী'। এটি নামের শেষে পদবীরূপে ব্যবহৃত হয়। আমি নিজেই 'বাংগীবাড়ী' অর্থাৎ বাংগী উপাধিধারী মুসলমানদের বাড়ী দেখেছি। রাজশাহী জেলায় 'বাংগু' শব্দের অর্থ কৃষক। বাংগু-থেকে বঙ্গ-বাংগী-বাঙালী প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব কি না কে জানে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত আঞ্চলিক শব্দের অভিধানে এমন অসংখ্য শব্দ দেখা যায় যেগুলোর ভদ্র মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব শব্দ কি প্রাচীনকালের আদিবাসীদের কথিত ভাষা হতে এসেছে? এ-প্রশ্নের জবাব পণ্ডিতেরা দিতে পারেন।

•

বাংলাভাষা ও বাঙালীর লোক-সংস্কৃতির জন্মকাল

আমার সঙ্গে বিদগ্ধজনের মতৈক্য হবে এ আশা করি না। লিখিত বাংলাভাষার জন্মকালকে আমি এ কালের বাংলাভাষাভাষী মানব সমাজের যৌথক্রিয়া প্রসূত লোক-সংস্কৃতির শৈশবকালরূপে নির্দেশ করতে চাই। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে তার পশ্চাদভূমির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। সূচনায় উল্লেখ করেছি যে, আর্য-আগমন পূর্ব ভারতবর্ষে দু'টি সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। একটি ছিল সিন্ধু উপত্যকায়ঃ মহেঞ্জোদারো হরাপ্পায়। ওটা ছিল নগর-সভ্যতা। ঐ-সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সুমেরীয় বেবিলনীয়—এমন কি প্রত্নতত্ত্ববিদ অতুল সুরের মতে, রাঢ় ও আসাম অঞ্চলবাসীদেরও যোগসূত্র ছিল। খননের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি হতে মহেঞ্জোদারো হরাপ্পাবাসীদের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনযাপনপ্রণালী বিষয়ে কিছু কিছু সিদ্ধান্তে এসেছেন বিশেষজ্ঞগণ। দেবদেবী রূপে উপাসিত কিছু কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। আর্যগণের আগমনের পর উক্ত আরাধনা পদ্ধতি শক্তি এবং শিবের উপাসনায় রূপান্তরিত হয়। প্রাপ্ত দেবমূর্তির আকৃতি এবং তার সঙ্গী পশুদের দেখলে শিবের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

দাক্ষিণাত্য ছিল দ্রাবিড় জাতির আবাসভূমি। এ প্রবন্ধে প্রাচীন দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক মনে করছি। আর্যগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে অনেক পরে।

আর্য আগমন-পূর্ব ভারতের বর্তমান বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার কিছুকাল মধ্যেই বঙ্গভূমির অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। প্রাচীন আর্য সাহিত্যে বঙ্গভূমির উল্লেখ আছে। কিন্তু আর্যরা বঙ্গভূমি এবং তার অধিবাসীদের সুনজরে দেখতেন না। ওরা বঙ্গভূমির অধিবাসীদের দস্যু, ম্লেচ্ছ, 'সংকীর্ণ যোনয়' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করেছে। বঙ্গে গমনাগমন সম্ভবত নিষিদ্ধ ছিল। নিষেধ অমান্যকারীকে প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠতে হতো। সম্ভবতঃ তৎকালীন বাংলার খাদ্যাখাদ্য, ভাষা, পোশাক পরিচ্ছদ, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক বিন্যাস, আচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি সব কিছুই আর্যদের হতে পৃথক ছিল। পার্থক্য ভালো মন্দ নির্ণয়ের মানদণ্ড নয়, যদিও সাধারণ মানুষ তাই মনে করে থাকে। অর্থাৎ পার্থক্য তৎকালীন বঙ্গীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনায় আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না। যা প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে বঙ্গভূমি ও তার অধিবাসীগণ সম্পর্কে আর্যরা অবহিত ছিলেন, কিন্তু উপনিবেশের সংখ্যা বৃদ্ধি অনাবশ্যক মনে করেই হোক অথবা ভয়েই হোক প্রাচীন আর্যরা বাংলায় আগমন করতে চান নি। প্রাচীন বাঙালীর লিখিত ভাষা হয়তো ছিল না ; হয়তো কতগুলো আঞ্চলিক বোল (Dialect) ছিল, যার উল্লেখ আগেই করেছি। এ-কালের আঞ্চলিক বোলেও তার কিছু কিছু নিদর্শন আছে। এমন কি আমাদের লিখিত ভাষায়ও এমন বহু শব্দ আছে যার উৎস তারা নিজেরাই। কিছু কিছু আঞ্চলিক প্রবাদ এবং ভদ্র সমাজে একান্তে ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দও সম্ভবতঃ সেই আদি বাংলা ভাষার সাক্ষ্যরূপে বিদ্যমান। মোট কথা, আর্য আগমন-পূর্ব বাংলার লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। এ-কারণেই আমি লিখিত বাংলা ভাষার জন্মকালকে আমাদের পরিচিত লোক-সংস্কৃতির শৈশবকাল বলেছি।

চর্যা গান রচয়িতাদের জন্ম-মৃত্যুকাল অষ্টম হতে দ্বাদশ শতাব্দী ধরা হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা ভাষার জন্মকালকে টেনে টুনেও হাজার বছরের অধিক পশ্চাতে নিয়ে যাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক বিচারে খুবই সামান্য সময়। তখনও এ কালের সমগ্র বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের নাম বাংলা বা বাংলাদেশ হয় নি। অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, গৌড়, লক্ষণাবতী, পুন্ড্রবর্ধন, সমতট, পট্টিকেরা প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল আজকের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল। এখানে পুনরুল্লেখ্য যে, আর্যদের ভারতাগমন হয় খৃস্টপূর্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বা তার কাছাকাছি কোনো একটা সময়ে। ওরা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয় আরো অন্ততঃ এক হাজার বৎসর পরে খৃস্টপূর্ব পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে। গোটা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর বাংলার কিয়দংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। পূর্ব বঙ্গ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নি। কিন্তু খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তর বাংলার ঐ অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাজা শশাঙ্ক গৌড়াধিপতি হন। ঐতিহাসিকেরা রাজা শশাঙ্কের জাতকুল নির্ধারণ করতে না পেরে তাঁকে অজ্ঞাতকুলশীল বলায় মনে হয় তিনি নীচকুলশীল ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় ষাঁড়ের ছবি অঙ্কিত থাকায় তাঁকে শিব ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ শিবের পূজারী মনে করা হয়। আগেই হলেছি শিব অনার্য দেবতা। গুপ্ত রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক। ওদের মুদ্রায় বিষ্ণুর প্রতিকৃতি দেখা যায়। ৬১৯-৬৩০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খৃস্টাব্দের মধ্যে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে যশোবর্ধন বর্তমান বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের কিছুটা জয় করেন। আরো অনেকে এ অঞ্চল অধিকার করতে আসেন। কিন্তু স্থায়ী হতে পারেন নি। শশাঙ্কের পরে পূর্ব-খদগা নামক এক রাজবংশ কিছুকাল রাজত্ব করেন কিন্তু সম্ভবতঃ দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারেন নি। দেশে অরাজক অবস্থা (মাৎস্যন্যায়) চলতে থাকে। এ-অবস্থার প্রতিকারকল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর, খুব সম্ভবত অবস্থাপন্ন ধনী শ্রেণীর লোকজন (প্রকৃতি) মিলে গোপাল নামক একজন মাতব্বর ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসায়। পালবংশীয় রাজত্ব শুরু হয়। পাল বংশীয়রা ছিলেন গৌড়াধিপতি। পরবর্তীকালে সেনবংশ বাংলায় রাজত্ব করেন। সেন রাজত্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি বিদ্যমান ছিল। ঐ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই ইখতিয়ারুদ্দীন ইবনে বখতিয়ার খলজীর অভিযানের মুখে সেনবংশের শেষ রাজা রাজধানী ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও আরো কিছুকাল সেন রাজাদের আধিপত্য ছিল। তারপর সম্পূর্ণ বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত প্রাচীন বাংলার এ-ইতিহাস দু'টি বিষয় প্রমাণ করে। প্রথমতঃ আদি অকৃত্রিম বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী আর্যগণ অবিমিশ্র অবস্থায় বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে প্রবেশ করে নি অথবা করতে সক্ষম হয় নি। আর্যরা যখন পশ্চিম ও উত্তর বাংলায় প্রবেশ করে তখনও ভারতে বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে বৌদ্ধমত সংশোধিত পরিবর্তিত এবং নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। বৌদ্ধমতে তন্ত্রমন্ত্র ঢুকে পড়েঃ বর্ণশ্রেষ্ঠত্বও স্বীকৃতিলাভ করে। কিন্তু এটা ঠিক যে, আদি বৌদ্ধমতে বর্ণভেদ যেমন স্বীকৃত নয় তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঐ মত নীরবঃ প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধমত এক ধরনের নিরীশ্বরবাদ। বৌদ্ধমত বহুকাল রাজধর্ম ছিল। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গৌড়ে পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে, উত্তর ভারতে বৌদ্ধমতের আধিপত্য থাকাকালে অগণিত বৌদ্ধ ভিক্ষু অবশ্যই বাংলায় প্রবেশ করে থাকবেন।

অপরদিকে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মে তার আগেই ভেজাল প্রবেশ করেছিল। ভারত আগমনকারী এবং ভারতে রাজত্ব স্থাপনকারী বহির্ভারতীয় যোদ্ধৃ শ্রেণীকে ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত করে নেয়া হয়েছিল। খৃস্টীয় ৮-৯ম শতাব্দী শঙ্করাচার্যের কর্মকাল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার রোধ এবং ভারতে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একচ্ছত্রাধিপত্য স্থাপনের জন্যে মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি শুধু পণ্ডিত ছিলেন না কৌশলী কূটনীতিকও ছিলেন। শঙ্করাচার্য উচ্চবর্ণীয় বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্যে বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের জন্যে নির্ভেজাল অদ্বৈ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবাদ-অর্থাৎ নিরাকার, নির্বিকার, নির্গুণ পরম ব্রহ্ম বা পরম সত্য প্রচার করেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম হতে ব্রাহ্মণ হন মুক্ত। অপর দিকে ব্যৈক্তিক ঈশ্বরে প্রণতি জানিয়ে আত্মিক সন্তোষ, ইহজাগতিক সুখ সুবিধা এবং পরকালে স্বর্গসুখ ভোগার্থী নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের জন্যে তিনি প্রতিমা অর্থাৎ গুণবান ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের প্রতীকরূপে নির্মিত মূর্তি পূজারও ব্যবস্থা করেন।

চরম অদ্বৈতবাদী (monist) শঙ্করাচার্যকে নিরীশ্বরবাদীও বলা যায়; কেননা নিরাকার, নির্গুণ, নির্বিকার ঈশ্বর মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ তথা হিত অহিত দুটোর কোনোটাই করতে পারেন না। শঙ্করাচার্যের এই অদ্ভত দ্বৈত অদ্বৈতবাদী দর্শন দু'দিক থেকে ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের বিশেষ সহায়ক হয়। প্রথমতঃ তার নির্ভেজাল অদ্বৈতবাদ (Monism) নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধমত এবং চার্বাক মুনির নামে প্রচারিত লোকায়ত দর্শনের সঙ্গে একটি কৌশলগত আপস। দ্বিতীয়তঃ ব্যৈক্তিক বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর গুণবাণ ঈশ্বরের প্রতীকরূপে নানা দেবদেবী, অচেতন জড় পদার্থ, গাছ-গাছড়া প্রভৃতি পূজায় অভ্যস্ত এবং জাদু টোটকাটাটকিতে আস্থাবান আর্য-অনার্য নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চতুর্বর্ণীয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে লীন করার সংগোপন লক্ষ্য এতদ্দারা পূরণ হয়ে থাকবে। দাসরা (শূদ্র) অস্পৃশ্যই থাকলো কিন্তু হিন্দু নাম পেলো। বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলেও উক্ত রিভাইভালিজমের ঢেউ এসে লেগেছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের ব্রাহ্মণ কর্মচারী নিয়োগ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং রাজ-কর্মচারীদেরকে ভূমিদান এবং সেন রাজাগণ কর্তৃক কুলীন ব্রাহ্মণ আমদানি তার প্রমাণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাল ও সেন রাজাদের চার শতাধিক বৎসরকাল রাজত্বকালে সাধারণভাবে বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় নির্ভেজাল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। তার প্রথম কারণ, আগেই যেমন উল্লেখ করেছি, রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বহু অনার্য দেবদেবীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় কারণ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে তৎকালে রাজকীয় ক্ষমতা দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়তঃ অল্পকাল স্থায়ী সেন রাজবংশের রাজত্বকালের শেষ দিকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লোপ পায়। ১১৯৬ খৃস্টাব্দে জনৈক মহামাণ্ডলিকের পুত্র সুন্দরবনে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১২০৪-২০ সাল মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে ঃ রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব নামক এক ব্যক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ময়নামতিতে অধিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহার যার বা যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হোক না কেন, তদ্দারা এটা প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধমত তখনও পূর্ব বাংলায় বেশ প্রবল। উক্ত নরপতিদ্বয় নিম্নবর্ণের লোক ছিলেন বলে মনে হয়। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বেও ঢাকা জেলার কোন কোন অঞ্চলে চাড়াল রাজার রাজত্ব বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা লোক-কাহিনী প্রচলিত ছিল। বাল্যকালে আমি নিজেই মুরুব্বীদের মুখে এ-সব লোক-কাহিনী শুনেছি। তার মধ্যে ভাওয়াল পরগণার মধ্যস্থলে অবস্থিত বিশাল বেলাই বিলের উপর দিয়ে শ্বশুর বাড়ী হতে প্রত্যাগমনরত পুত্রবধূ ও নাতিনাতনীদের নৌকাডুবিতে প্রাণ বিয়োগের সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ রাজা 'খাইড্ডা ডোশকা'র বেলাই বিলের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনীটি বাল্যকালে আমাকে রোমাঞ্চিত করত। রাজা 'খাইড্ডা ডোশকা' নাকি বেলাইর উপর 'কাগাবগা' (কাক ও বক) চরাবার শপথ গ্রহণ করেন। অসংখ্য খাল কাটিয়ে এ বিলের জল নিষ্কাশিত করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই কারণেই নাকি শীতকালে বেলাই শুকিয়ে যায় ঃ সেকালে নাকি বেলাই ছিল এক বিস্তীর্ণ পাথার বা হ্রদ।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, "পাহাড়পুর এবং ময়নামতির মৃৎফলক কলার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লৌকিক এবং সাধারণ লোকায়ত কৃষি জীবনের মানস কল্পনাই ইহাদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—ইহারা রস আহরণ করিয়াছে লোকায়ত দৈনন্দিন জীবন হইতে। এই অসংখ্য ফলকগুলিকে সারি সারিভাবে সাজাইয়া দেখিলে মনে হয়, লোকায়ত জীবন যেন এক বিচিত্র শোভাযাত্রায় চলিয়াছে, যেন এই মৃৎশিল্পীরা অনুভূতি ও সচেতন বস্তু, অভিজ্ঞতার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবিরত আন্দোলিত হইয়াছেন, এবং সেই আন্দোলন ফলকগুলির উপর প্রত্যক্ষ।" ডক্টর নীহার রায় আরো জানাচ্ছেন যে, ঐ সময়ে চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে ব্রহ্মদেশ, নাগদেশ এবং চীন পর্যন্ত লোক চলাচলের রাস্তা ছিল। উক্ত দুটি বৌদ্ধ বিহার পাল সেন বংশীয়দের রাজত্বকালে নির্মিত হওয়ার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ।

চর্যাপদ রচিত হওয়ার পূর্বে বাংলায় যে জনজীবন ছিল, যে ভাষায় ওরা কথা বলতো তার কোনো লিখিত দলিল নেই সত্য; কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি যে, সেকালেও এ অঞ্চলের জনসমাজে ধর্ম বিষয়ক—এমন কি প্রেম বিরহ ও আদি রসাত্মক লোকগাথা (Ballad) নানা উপলক্ষে গীত হতো। লোকজীবনের স্বাভাবিক ধর্মই এই। কোনো না কোনো প্রকারের বাদ্যভাণ্ড অবশ্যই ছিল। সব কিছুরই প্রস্তুতিপর্ব থাকে। বীজের জন্ম আগে নাকি গাছের জন্ম আগে এ প্রশ্নের সদুত্তর বোধ করি উদ্ভিদ বিজ্ঞানীও দিতে পারবেন না। আমরা চর্মচক্ষে সকলের আগে দেখতে পাই গাছের গোড়াটা। শাখা-প্রশাখা পত্রপুষ্পে গাছ বিকশিত হয় পরে। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে দেবদেবীর মন্দিরে সেবাদাসীরা ছিলেন। ভারতীয় মন্দিরেও ছিলেন ওরা। পাল ও সেন শাসকদের রাজান্তপুর এবং নগরজীবনের বৃত্তান্ত প্রমাণ করে যে, দেশে তখন যৌন সহজিয়াবাদ ছিল। কোনারকের সূর্য মন্দির গাত্রে রতিক্রিয়ারত নারী-পুরুষের চিত্র খোদিত আছে। মহাভারতের কুন্তী কাহিনী দ্রোপদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনী এবং পৌরাণিক মহর্ষি উদ্দালকের স্ত্রীকে পুত্র শ্বেতকেতু এবং স্বামীর সমুখ থেকে জনৈক কামাতুর ব্রাহ্মণ কর্তৃক টেনে নিয়ে যাওয়ার কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো এক কালে মৈথুন বিষয়টার সঙ্গে সুনীতির (Morality) কোনো সম্পর্ক ছিল না। ক্রুদ্ধ পুত্রকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে উদ্দালক বলেছিলেন, "সকল স্ত্রীই গাভীদের মতো স্বাধীনা। সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম হয় না ইহাই সনাতন ধর্ম।" অর্থাৎ আহার নিদ্রার মতো সেক্সকেও নিছক জৈবধর্ম জ্ঞান করা হতো। এ-সব বিষয় বাদ দিলেও, চর্যাগানের রচনাকাল (পাল ও সেন আমল) সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, উচ্চ বর্ণীয়দের রাজত্ব এবং প্রভুত্ব সত্ত্বেও তখন দেশে অব্রাহ্মণ্য ধর্মমত, নৃত্যগীত প্রভৃতি তার বৈশিষ্ট্য-সহ বেশ ভালোভাবেই বিদ্যমান। বৌদ্ধদের মধ্যে মতভেদের বিষ প্রবেশ করা সত্ত্বেও চর্যাপদে সমকালীন সাধারণ সমাজ-জীবনের একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। চর্যাগীতিতে ডোমডোমনী, শবর শবরী, নিষাদ কাপালিক প্রভুতির উল্লেখ আছে। ওরা বাংলার আদিবাসী অস্পৃশ্য। চর্যাপদে গরীবের পর্ণকুটির, তার অভাব অভিযোগ এবং অন্নকষ্টের বিবরণের সঙ্গে সম্পন্ন লোকদের ঘরে দুধের সর তোলার বিবরণ স্থান পেয়েছে। হয়তো ঐ স্মৃতি থেকে উত্তরকালের পল্লীকবি রচনা করেছিলেন,

বেহানে উঠিয়া যাদুরে চাইল দুগ্ধ ননী
আর ক্ষীর
যাচিয়া না পাইনু দুগ্ধ ননীরে
ও আমার যাদু।

পদটি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে।

চর্যাগানের উল্লেখ করে আমি এ-কথাটাই জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আধ্যাত্মিক প্রেরণাজাত হলেও চর্যাগীতি ইহজাগতিক প্রতীকে রচিত। গীতগুলোতে লোকজীবন প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং লোকায়ত দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত সামাজিক চেতনা—শ্রেণী চেতনা বললেও অত্যুক্তি হয় না—সেকালেও আমাদের অঞ্চলের জনজীবনকে আন্দোলিত, অনুপ্রাণিত এবং কমবেশি পরিচালিত করেছে বললে সম্ভবত ঐতিহাসিক সত্যই বলা হয়। প্রসঙ্গত অন্য একটি বহুল প্রচলিত লোককাহিনী উল্লেখযোগ্য। চম্পাইনগরের চাঁদ সওদাগরের কাহিনী ভাসান যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল। মনসা অর্থাৎ সর্প আর্য-দেবদেবীদের কেউ নয়। সে ওলা বিবির ন্যায় নিতান্তই আঞ্চলিক দেবতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাদ সওদাগর মনসার পূজা দিতে রাজী হননি। মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে চাঁদ সওদাগরের একমাত্র পুত্র নখিন্দরকে দংশন করে। পরে পুত্রবধূ বেহুলার পূজায় মনসা সন্তুষ্ট হয়ে নখিন্দরকে প্রাণ দান করে। কিন্তু চাঁদ সওদাগরকে সর্পদেবীর বেদীতে অর্ঘ্যদান করতে হয়। তবে তিনি মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে অর্ঘ্যদান করেন বলে কথিত আছে। চাঁদ সওদাগর যদি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতীক হয়ে থাকেন তবে তাঁর নিচ্ছিদ্র গৃহে স্থানীয় লোকদেবতা মনসাকে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে। চাঁদ সওদাগর আঞ্চলিক লোকদেবতার কাছে পরাজয় মানতে বাধ্য হয়েছেন। সওদাগর ফার্সি শব্দ। চাঁদ সওদাগর যদি নবাগত ইসলাম ধর্মের প্রতীক হয়ে থাকেন তাহলেও তাকে তৌহিদ বর্জন করে আঞ্চলিক লোকদেবতার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছে। মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে অর্ঘ্যদান করে তিনি ক্ষীণ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

ইতিহাসের ক্রান্তিকাল : ইসলাম ধর্মের প্রবেশ

বর্তমানকালে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মবিশ্বাসগুলোর কোনোটাই যার যার উদ্ভবকালে সম্পূর্ণ অভিনব কিছু ছিল না। ধর্ম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির মতো সহসালব্ধ কোনো বস্তু নয়। প্রতিটি ধর্ম পূর্ববর্তীকালের সামাজিক জীবনের স্মৃতি নানা উপকথা ও কাহিনীরূপ আত্মসাৎ করে আত্মপ্রকাশ করেছে ঃ প্রাচীন সামাজিক জীবনের নানা আচার আচরণ প্রথা পদ্ধতি কখনও অবিকলভাবে কখনও বা সংশোধিতভাবে গৃহীত হয়েছে। বাইবেল পুরাতন খণ্ডের (Old Testament) সকল নবী এবং তাদের কাহিনী ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত। ঐ পুস্তকের বহু আইন কানুন বিধি বিধান ও সামাজিক পদ্ধতি ইসলাম গ্রহণ করছে। হজ্বের সময় পালিত কিছু কিছু অনুষ্ঠান ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেও আরবে প্রচলিত ছিল। অপর দিকে পুরাতন টেস্টামেন্ট পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সেটাতে লিপিবদ্ধ বহু আইন কানুন প্রকৃতপক্ষে ঐ গ্রন্থ সংকলিত হওয়ার বহুকাল পূর্বে প্রবর্তিত রাজা হাম্মুরাবির আইন। একমাত্র পার্থক্য, হাম্মুরাবি তাঁর আইনগুলো সূর্য দেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে কথিত আছে, পক্ষান্তরে মুসা নবী পেয়েছিলেন তুর পাহাড়ে ইহুদী সম্প্রদায়ের ঈশ্বর জিহোভার কাছ থেকে সরাসরি। বিবাহ, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতি ব্যাপারে যে সব বিধি-নিষেধ ইসলাম ধর্মে বিদ্যমান তার প্রায় সবগুলোই পুরাতন টেস্টামেন্টে পাওয়া যায়। বেদ হিন্দুদের কাছে আসমানী কেতাব রূপে গণ্য। বৈদিক ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Max Weber বলেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"In individual instances residues of ancient orgiasticism are to be found in the Vedas. Indra's drunkenness and dance, and the sword dance of the Maaruts (corybanties) stem from the intoxication and ecstasy of heroes. Moreover, it is obvious that the great priestly soma-sacrifice was originally a cult-tempered intoxication orgy. The much discussed dialogues of the Rigveda are presumably the slender residues of cult drama" (Religion of India, Free Press Paperback, P. 137.)। ব্রাহ্মণগণ সুপ্রাচীন লিঙ্গ পূজার যৌনমদমত্ততার দিকটি গোপন রাখার চেষ্টা করেন ঃ ওটার ওপর sublimity বা এক অতীন্দ্রিয় নান্দনিকতার প্রলেপ লাগান। কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। Max Weber এর কথায়,

"In truth, of course, though not recognised by authority, blood, alcohol and sexual orgies remained the domain of actual folk-cult of Siva. (Max Weber, Ibid. p. 306).

চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধের জন্যে যে-সব শাস্তির বিধান পুরাতন টেস্টামেন্টে আছে ইসলাম ধর্মেও ওসব অপরাধের জন্য প্রায় অনুরূপ শাস্তির বিধান আছে। খতনা প্রথাও পুরাতন টেস্টামেন্ট থেকে এসেছে। পশু ও নরবলি প্রথাও বহু পুরাতন। বহুকাল প্রচলিত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রথা-পদ্ধতি সমকালীন সমাজের প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হলে সংস্কার ও সংশোধন আবশ্যক হয়। শাসক শ্রেণী সেই আবশ্যকতা মেনে না নিলে রক্তাক্ত বিপ্লব শূন্যস্থান পূরণ করে। সংস্কার ও সংশোধনের আবশ্যকতা থেকে সকল নতুন ধর্মবিশ্বাসেরও উদ্ভব। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার বহুকাল পূর্বেও নিরাকার একেশ্বরবাদী এবং অদ্বৈতবাদী চিন্তা ভারত-সহ পৃথিবীর নানা স্থানে ছিল। ভাল এবং মন্দ, good and evil, পরমেশ্বর এবং ইবলিস-এ চিন্তাও ছিল প্রাচীন পৃথিবীতে। প্রাচীন ইরানের আলো এবং আঁধার চিন্তার উল্লেখ করা যেতে পারে। কোরান শরিফ বলে, বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে নবীর উদ্ভব হয়েছে এবং যার যার ভাষায় একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য ও মিশরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সংবলিত নানা কাহিনীর স্মৃতি বহন করেই নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। অপরদিকে লিখিত ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রত্যেকটিতে যার যার সমকালীন আঞ্চলিক ভাষা তার তৎকালীন অর্থসহ ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা এখনও লিপির উদ্ভবকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি নি। বহু ভাষা ও লিপির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার জন্ম হয়েছে লিপি তৈরী হওয়ার বহু পূর্বে। তাই লিখিত ভাষা ও তার শব্দরাজির মধ্যে স্বভাবতঃই তারও পূর্বের মানবসমাজের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা কম বেশি স্থান পেয়েছে। ভাষা মানুষের মনন শক্তির ফসল। মনন ও চিন্তাশক্তি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নতুন শব্দরাজি সংযোজিত হয়েছে। প্রাচীন শব্দ নতুন অর্থ গ্রহণ করেছে—বহু শব্দ পরিত্যক্তও হয়েছে। অর্থাৎ ভাষা রূপান্তরিত হচ্ছে। সর্বক্ষেত্রে এ রূপান্তর ক্রিয়া অব্যাহত আছে বলেই মানব-সমাজ আজ যেখানে অবস্থান করছে সেখানে এসে পৌঁছেছে।

ইসলাম ধর্মও এ বিবর্তন ক্রিয়ার মধ্যে একটি অধ্যায়। ধর্ম ইহজগতে জীবন-যাপনকারী মানবজাতির জন্যে। পরলোকে ধর্মকর্ম পাপপুণ্য সুফল কুফল প্রভৃতি কিছুই নেই। মানবজাতির মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে এবং তারা নানা ভাষায় কথা বলে। কিন্তু ঐতিহাসিককালে এশিয়া আফ্রিকা ইয়োরোপের মানবসমাজ কখনও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এ-তিন মহাদেশের সর্বত্র একই ধরনের অসংখ্য লোক-কাহিনী ও উপকথা প্রচলিত। এটা সংযোগের একটি প্রমাণ। তাই প্রবর্তিত হওয়ার সন তারিখ যাই হোক, ব্যাপকভাবে প্রচারিত এবং উদ্ভবস্থলের বাইরে অন্যত্র গৃহীত হওয়ার কালে কোনো 'নবীন' ধর্ম তার অবিকৃত আদিরূপ (আদিরূপ বলে যদি কিছু থাকে) রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। এক ভাষাভাষী এবং অভিন্ন অতীত স্মৃতিবাহী অল্প সংখ্যক লোকের সমাজ হতে বহির্বিশ্বের নানা ভাষাভাষী এবং নানা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তম মানবসমাজে প্রবেশ করার পর তাকে সমকালীন ঐতিহাসিক বাধ্য-বাধকতা মেনে নিতে হয়। অন্যদের বশীভূত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদেরও বহু ব্যাপারে বশ মানতে হয়। বিজয়ীরূপে রোমান এবং পারসিক সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার পর আরব মুসলিম শাসকগণকে রাজ্য শাসন ব্যাপারে রোমান ও পারসিক প্রথা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। কেননা বৃহৎ রাজ্য শাসন করার কলাকৌশল আরবদের জানা ছিল না।

ভারতে বিজয়ীরূপে প্রথম ইসলাম প্রবেশ করে ৭১২ খৃস্টাব্দে। তখন মুসলিম অধিকৃত অঞ্চল উম্মাইয়া সম্রাটদের শাসনাধীন। ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তখন কোথাও নেই। অপর দিকে সিন্ধু ও মুলতানে দু'টি পৃথক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে পাকাপাকিভাবে ইসলাম প্রবেশ করে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দিল্লীকে কেন্দ্র করে ভারতে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠালাভের পর। ইতোমধ্যে এশিয়া আফ্রিকার মুসলিম অধিকৃত ভূভাগ বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং অনারব জাতির লোকগণ বিভিন্ন রাজ্য শাসন করছিল। সুতরাং ভারতে যে ইসলাম রাজকীয় ধর্মরূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকাপাকিভাবে প্রবেশ করে সেটা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রবর্তিত আরবমরুর 'নির্ভেজাল' ইসলাম ছিল না। এ ইসলাম ইরান, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ পার হওয়ার কালে সে সব দেশের বহু প্রাচীন লোকাচার-সহ, প্রবর্তিত হওয়ার ৬০০ বৎসর পর, তুর্ক আফগান বিজয়ীদের সঙ্গে আসে। পরে তার মধ্যে চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, তৈমুর লঙ প্রমুখের উত্তরাধিকারীরাও যোগদান করেন।

অবশ্য পাকাপাকিভাবে সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পূর্বেও ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অল্প বিস্তর প্রবেশ করেছিল। বেসরকারী পর্যায়ে ইসলাম এনেছিলেন বণিক এবং সুফী দরবেশ শ্রেণীর লোক। সুফীগিরি দরবেশি প্রভৃতির কোনো স্থান হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রচারিত আদি ইসলামে নেই। মুসলমানকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। শিষ্যদের মুক্তি দেয়ার আম-মোক্তারনামা কোনো পীর দরবেশের হাতে নেই। ভারতে আগত পীর দরবেশ সুফীদের অধিকাংশই ছিলেন আজমী অর্থাৎ অনারব। ওরা ছিলেন প্রাচীন ইরানী, গ্রীক এবং ভারতীয় দর্শন আত্মস্থকারী মুসলিম প্রচারক। তা'ছাড়া কারবালার যুদ্ধের ফলাফলকে কেন্দ্র করে মুসলমান প্রথমতঃ শিয়া ও সুন্নীতে এবং পরে আরো বহু ফেরকা উপফেরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রচারকগণও বিভিন্ন ফেরকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে সুফী দরবেশদের অধিকাংশই ছিলেন মানবতাবাদী এবং বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়কারী। খাজা মইনুদ্দীন চিশতী, নিজামুদ্দীন আওলিয়া এবং বাংলাদেশের কোনো কোনো দরগায় হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বী লোকের উপস্থিতি এবং অভিষ্ট সিদ্ধির জন্যে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকা তার প্রমাণ বহন করছে।

দার্শনিক পটভূমি

দর্শন-শাস্ত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় দর্শন বিশ্বের দার্শনিক চিন্তা এবং বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতির মূল ভূমি। পারসিক সাম্রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের এশীয় ও আফ্রিকীয় অংশের বিরাট ভূভাগ বিজিত হওয়ার পর আরবীয় মুসলমানগণ গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং দর্শনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়। অপরদিকে মুসলিম অধিকার আফগানিস্তান, সিন্ধু ও মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভের ফলে আরবীয়রা ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞানেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধান পায়। সম্রাট আল মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩-৮৪৭ খৃঃ) বিপুল সংখ্যক গ্রীক, সিরীয়, কলডীয় এবং সংস্কৃত গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদে সহায়তা করার জন্যে বাগদাদের রাজদরবারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিযুক্ত ছিলেন। আব্বাসীয়দের আমলে বারমিকী পরিবারের ক্ষমতার বিষয় ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কোনো কোনো পন্ডিতের মতে বারমিকী পরিবারের আদি পুরুষ ছিলেন বলখের বৌদ্ধ মন্দির নব বিহারের ধর্মযাজক। কেউ কেউ বলেন সংস্কৃত প্রমুখ (প্রথম, প্রধান, শ্রেষ্ঠ) শব্দের অপভ্রংশ বারমিকী। বারমিকী পরিবার ইরান হয়ে বাগদাদে গমন করেন। গ্রীক ও হিন্দু দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের ফলে নবম শতাব্দীর প্রথমভাগেই মোতাজেলাবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। ওরা ছিলেন যুক্তিবাদী, মানুষের ক্ষমতার ওপর ওরা আস্থা পোষণ করতেন। ওরা বলতেন, হাশরের দিন সশরীরে মানুষের পুনরুত্থান ঘটবে না এবং চর্মচক্ষু দ্বারাও আল্লাহ্‌তালাকে দেখা যাবে না, কেননা তাহলে তাকে কায়াধারী প্রাণী মনে করা হয়। কোরান শরিফকে ওরা মখলুক অর্থাৎ 'সৃষ্ট' মনে করতেন। গুণাবলী ও আল্লাহ অভিন্ন—এ-মতও ছিল ওদের। সম্রাট আল মামুন নিজেই ছিলেন এ মতবাদী। অপর দিকে, প্রবন্ধের শুরুতেই যেমন উল্লেখ করেছি, ইহুদী এবং প্রাচীন ইরানী ধর্মবিশ্বাসের বহু স্মৃতি নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মের অনেক কিছু ইহুদী ধর্মে গৃহীত হয়েছিল। "পরকাল সম্বন্ধে যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মে যে মতবাদ প্রচলিত ছিল এবং এই মতবাদের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পুনরুত্থান, শেষ বিচার, নরকোপরিস্থ পুল, বেহেশত এবং দোজখ সম্বন্ধে যে ধারণার উদ্ভব হয়েছিল শেষ পর্যন্ত ইহুদী ধর্মের সাথে সেগুলোর এক মধুর সমন্বয় ঘটেছিল। এখান থেকেই এই ভাবধারাগুলো পৃথিবীর দুটো শ্রেষ্ঠ সেমিটিক ধর্মে অর্থাৎ খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মে প্রবেশ লাভ করে।" (গোলাম মকসুদ হিলালী, ইরান ও ইসলাম, পৃ. ৭)। দৃষ্টান্তরূপে ডক্টর গোলাম মকসুদ হিলালী নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছেন: (১) "পবিত্র কোরান শরীফে সিরাত বা পুল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। তবে হাদিস গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিতদের মতে "সিরাত" শব্দটি ল্যাটিন স্ট্রাটা (অর্থাৎ সোজা পথ) শব্দ হতে লওয়া হয়েছে। শব্দটির অভিধানিক অর্থ পথ। পবিত্র হাদিস গ্রন্থে ব্যবহৃত 'জিসর' (جسر) শব্দটি সিরাত শব্দেরই প্রতিশব্দ। প্রফেসর ব্রাউন বলেছেন, 'যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মের 'চিনবাদ' পুল এবং ইসলাম ধর্মের চুলের চাইতে সূক্ষ্ম ও তরবারির চাইতে ধারাল সিরাত বা পুলের বর্ণনার মধ্যে মিল দেখতে পেয়ে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারি না।" তুলনীয় গ্রীক হেডিস (Hades) এবং হিন্দু বৈতরণী। (২) ফিরদৌস শব্দটি মূলতঃ ফারসী শব্দ...পবিত্র কোরান শরীফে বেহেশতে উপভোগ্য যে সমস্ত বিষয়বস্তুর উল্লেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে 'হুর' তার মধ্যে অন্যতম, যেরোয়াস্ত্রীয় ধর্মশাস্ত্রে যেমন লাবণ্যময়ী ও সুন্দরী যুবতীর উল্লেখ আছে পবিত্র কোরান শরীফে তেমনি সুন্দরী রমণীর উল্লেখ আছে। বেহেশতের বর্ণনায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলছেন, "এটা এমনি শান্তি যা চোখ কোনদিনই দেখে নি, কান কোন দিন শ্রবণ করে নি এবং যা মানুষের অন্তর কোনদিন কল্পনা করতে পারে না।" (বোখারী ও মুসলিম)। তুলনীয় সেন্ট পল প্রথম পত্র, "যারা আল্লাহকে ভালবাসে আল্লাহ তাঁদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করেছেন যা চোখ কোনদিন দেখেনি, কান কোনদিন শ্রবণ করে নি এবং যা সম্বন্ধে অন্তর কোনদিন চিন্তাও করতে পারে নি।"

(৩) "পুনরুত্থান ব্যাপারে ইসলাম ও যোরোয়াস্ত্রীয় মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।.....হিন্দু ধর্ম দেহান্তরবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। পারসিক ও সেমিটিকগণও মৃত্যুর পর জীবাত্মার পরিণতি সম্পর্কে কিছুটা হিন্দু মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত।....জিন্দ আভেস্তার প্রথম অংশ গথোয় (gathas) উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যবান ব্যক্তিগণের আত্মা পরকালে সুখে থাকবে এবং পাপীদের আত্মা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।"

যেরোয়াস্ত্রীয় ধর্মের ঈশ্বর, শয়তান, ফেরেশতা, হুর, পুণ্যাত্মার পানীয়, পাপাত্মার পরিণতি, স্বর্গ ও নরক—নরকের ভয়াবহ শাস্তি, পুল, দাড়িপাল্লা, আদম হাওয়া, শয়তান প্রভৃতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ঐসব বিষয়ে ইসলামী ধ্যান ধারণার সাদৃশ্য দেখিয়ে ডক্টর হিলাল বলছেন, "শেষ বিচারের জন্য আত্মার সশরীরে পুনরুত্থানের কথা যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ।"

পরকাল, বেহেশত, দোজখ, পুনরুত্থান প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মমতের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমীর আলী বলেন,

"...The Jew, the Mago Zoroastrian, and the Christian all believed in a bodily resurrection. The crude notions of primitive mosaism had made way for more definite ideas derived chiefly from the chaldaeo-Zoroastrian doctrines.....Jew, Christian, and Zoroastrian all looked, more or less, to material rewards and punishments in a future existence....There is no doubt that in the Suras of the intermediate period, before the mind of the Teacher had attained the full development of religious consciousness, and when it was necessary to formulate in language intelligible to the common folk of the desert, the realistic descriptions of the heaven and hell, borrowed from the floating fancies of Zoroastrian, Sabean and the Talmudical Jew, attract the attention as a side

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

picture, and then comes the real essence—the adoration of God in humility and love. The 'hooris' are creatures of Zoroastrian origin, so is paradise, while hell in the severity of its punishment is Talmudic. The descriptions are realistic, in some places almost sensuous."

এ পর্যন্ত বলার পর আমীর আলী এই যুক্তি উত্থাপন করেছেন—

"But to say that they are sensual or that Mohammed, or any of his followers, even the ultra-literalists accepted them as such, is a calumny. The wine 'that does not inebriate' and the attendants 'that come not nigh' can hardly be said to represent sensual pleasures." (Spirit of Islam. P. 197).

রুচিবান উচ্চশিক্ষিতদের কাছে স্বর্গ-নরক-হুর, গেলমান, মদ্য প্রভৃতির অর্থ যাই হোক নিরক্ষর সাধারণ মানুষের কাছে ওগুলো আক্ষরিক অর্থেই বোধ্য। এমন কি 'মেরাজ' এবং 'পাঁচ বার উপাসনা' করার চিন্তাও ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই পৃথিবীতে ছিল।

সাধু পল তার দ্বিতীয় পত্রে লিখছেন, "আমি একজন খৃস্টানকে জানতাম...। এই লোকটিকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো। কেমন করে যেন তাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখানে এমন অবর্ণনীয় কথা বলে তাঁকে শুনানো হলো যা মানুষের পক্ষে উচ্চারণ করা অন্যায় ও আইন বিরুদ্ধ।" (হিলালী, পৃ. ৭৪)। মুসলমান বিশ্বাস করে, হজরত ঈসাকে জিন্দা অবস্থায় চৌঠা আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তিনি সেখানে বসবাস করছেন।

"জরাথুস্ত্র বলছেন,—ও আহুরা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমাকে সত্য কথা বলে দাও। কোন্ আত্মা (এখানে অভিভাবক, স্বর্গীয় দূত) আমাকে ভাল কথা বলতে পারে। অর্থাৎ দিনে পাঁচবার উপাসনা করার কথা কে বলবে? হে মাজদা উক্ত উপাসনার জন্য তুমিই হুকুম করেছ।...এই পাঁচ প্রকার গাথা বা দৈনিক নির্ধারিত উপাসনার কথা শাপুরের (৩১০-৩৭৯ খ্রীঃ) আমলে লিখিত খোরদ অবেস্তায় উল্লেখ আছে।"

এমন কি ওজু, সেজদা ও এক মাস রোজাও নতুন কিছু নয়। "মুসলমানদের ন্যায় মানী মতাবলম্বীগণও দিনে পাঁচবার উপাসনা করত এবং মুসলমানদের মত তাদের উপাসনার মধ্যেও সেজদা করার ব্যবস্থা ছিল। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্মের বহু আগে মানী মতাবলম্বীদের মধ্যে উপাসনার আগে পবিত্রতার জন্য ওজু করার ব্যবস্থা ছিল। তারা একমাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোজাও পালন করত। এটা হয়ত খুব অবাস্তব বলে মনে হবে না যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আংশিকভাবে মানী ধর্ম থেকে কিছু গ্রহণ করেছিলেন।" (খোদা বক্সের History of Islamic Civilization নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠা হতে ডক্টর হিল্লালীর উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

ভারতীয় দর্শন ছয়টি মূল বিভাগে বিভক্ত। গ্রীক দর্শনেরও নানা বিভাগ ও শাখা প্রশাখা আছে। প্রাচীন ইরানের আলো আঁধার, ভারতীয় সুর অসুর, ইহুদী খৃস্টীয় ইসলামী ঈশ্বর ও শয়তান মূলতঃ একই ধরনের চিন্তা। স্রষ্টা ও সৃষ্টির উৎপত্তি এবং উভয়ের আলাদা অথবা দু'য়ে মিলে অভিন্ন সত্তার ভূমিকা, মানবজাতির সঙ্গে পরমেশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ক চিন্তা ভাবনা হতেই পদ্ধতিগত দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব। ভারতীয় দর্শনে চারটি চিন্তাধারার প্রাধান্য বিদ্যমান। একদল কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে পৃথক সত্তারূপে চিন্তা করেছেন। এদের মতে সৃষ্ট প্রাণীকে (মানুষকে) স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। দ্বিতীয় দল, স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে অভিন্ন মনে করেন ঃ সত্য এ্যাবসল্যুট ঃ পরিদৃশ্যমান বস্তু (phenomenon) সতত বিলীয়মান অর্থাৎ মায়া মাত্র। এই মায়া প্রতিনিয়ত পরম সত্য বা সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বিলীন হওয়া পরিদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুর ধর্ম। পরম সত্য বা সত্তার আকার, বিকার, গুণ, আরম্ভ, ইতি এবং কারণ নেই। নিয়তিবাদকে এ-মতেরই একটি শাখা বলা যায়। তৃতীয় মতে স্থানকাল অবিভাজ্য আদি অন্তহীন এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা গঠিত এক মহা বিস্ময়। চতুর্থ মতাবলম্বীদেরকে সন্দেহবাদী বা অবিশ্বাসী নৈরাজ্যবাদী বলা যায়। স্থূল জড়বাদ এ মতবাদ প্রসূত। স্থূল জড়বাদীরা খাও দাও ফূর্তি করো নীতিতে আস্থাবান। গ্রীক বাক্কাস এবং ভারতীয় চার্বাক সম্ভবত এ মতবাদীদের আদি গুরু। ভারতীয় লোকায়ত দর্শনেরও গুরু চার্বাক এবং চার্বাকের গুরু দেবতা বৃহস্পতি স্বয়ং।

প্রথমোক্ত মতাবলম্বীগণ ব্যৈক্তিক ঈশ্বর এবং তার নিয়মিত আনুষ্ঠানিক আরাধনায় বিশ্বাসী। এটা বহু পুরাতন বিশ্বাস। সম্ভবতঃ Savagery 'র যুগ হতে Barbarism এর যুগ-মধ্যে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অনুকূল এবং হিংস্র জন্তুর শত্রুতা হতে আত্মরক্ষা অথবা ওদের বশীভূত করার তাগিদ হতে উদ্ভূত। পরবর্তীকালে এ মত পরিষ্কৃত ও পরিশ্রুত হয়েছে। এ-মতাবলম্বীরা কর্মফল অনুযায়ী পাপপুণ্য, স্বর্গ নরক, পুনর্জন্ম পুনরুত্থান, জবাবদিহি, বিচার প্রভৃতিতে বিশ্বাসী। এরা এক ঈশ্বর অথবা তাঁর বিভিন্ন গুণের প্রতীক অথবা সর্বগুণান্বিত অনাদি অনন্ত নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের তুষ্টি সাধনের জন্যে নিয়মিত উপাসনা ও পূজার্চনায় আস্থাবান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় মতবাদ হতে নিরীশ্বরবাদ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতাবাদের উদ্ভব। বুদ্ধের বাণীতে ঈশ্বর অনুপস্থিত। এ-মত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ নিবন্ধের জন্যে অনাবশ্যক। আগেই বলেছি নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধ পরবর্তীকালে নিজেই বৌদ্ধদের আরাধ্য ঈশ্বরে পরিণত হন। বুদ্ধ-বিরোধী ব্রাহ্মণ্য ধর্মও তাকে অবতার মেনে নেয়। সুতরাং ভারতে নাস্তিক্য বা নিরীশ্বরবাদ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। এখানে এ-কথাটি বলে রাখা যায় যে, তৃতীয় মত হতেই আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু।

দ্বিতীয় মতবাদ বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়া এবং তার ধর্ম পরম সত্তা বা সত্যে বিলীন হওয়া বিধায় মানুষের কার্যকলাপের জন্যে সে নিজে দায়ী নয়। মানবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। অদৃশ্য এক জাদুকর অদৃশ্য সূতোর সাহায্যে পৃথিবী নামক মঞ্চে মানুষ নামক পুতুলগুলোকে খেলাচ্ছে। ভাষার মার প্যাঁচ সত্ত্বেও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথনে নিয়তিবাদই প্রচারিত হয়েছে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, প্রবচনটিতে এ-মতই প্রতিধ্বনিত। মুসলমানরা বলেন, "আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না।" আপাতঃদৃষ্টিতে প্যারডি মনে হলেও, গুরু শিষ্যবাদ পীর মুরীদবাদ ইত্যাদির মধ্যে "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবচনটি এ-দেশের সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত। এস্কাইলাইস, সফোক্লিস প্রমুখ গ্রীক কবি বিয়োগান্ত নাটকে যে বস্তু পরিবেশন করেছেন ধর্ম-পুস্তকরূপে সম্মানিত গীতায় সে বস্তুই উপদেশরূপে প্রচারিত। মুসলমানরাও বিশ্বাস করে রোজ আজলের লিখন খন্ডানো যায় না। এ-মতবাদীদের পক্ষে আপন কর্মফলে বিশ্বাস করা অস্বাভাবিক, কেননা এদের মতে কর্তা ও কর্ম এক এবং পরম সত্য বা সত্তা অভিন্ন। মানুষের একমাত্র কৃত্য সেই পরম সত্তার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়ার সহজতম পন্থা উদ্ভাবন করা—দ্বিতীয় মতাবলম্বী দার্শনিকদের একটি শাখার জীবনবোধ এই। পন্থার নির্দেশও ওরা দেন। প্রেম ও ভক্তি সেই পথ। প্রেমাশ্লেষে মিলিত হওয়ার এক বিশেষ মুহূর্তে মানব-মানবীর পৃথক সত্তাবোধ লোপ পায়। তারা এক অনির্বচনীয় মহানন্দের মধ্যে পৃথক অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলে। পরম সত্তার প্রতি প্রেম ভক্তিও হতে হবে ঠিক তেমনি গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। নাম জপ বা জিকর তার উপায়। গুরু বা পীর তার পর্যায়ভেদ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেন। গুরু বা পীরের মাধ্যম ব্যতীত সিদ্ধিলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। একটি শাখার মতে, প্রথমে গুরু বা পীরকেই হাজির নাজেররূপে ধ্যান করতে হবে। এ-পথে সিদ্ধি লাভের জন্যে আনুষ্ঠানিক উপাসনা অত্যাবশ্যক নয়। পরম সত্তায় বিলীন হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের ভারতীয় এবং আরবি প্রতিশব্দ যথাক্রমে নামকীর্তন (জপ), সমাধি ও লয় (নির্বাণ) এবং জিকর, ফানা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকা। এ পন্থায় সিদ্ধিলাভের জন্যে যা কিছু সহায়ক তাই গ্রহণীয়। যেমন জপ ও জিকরের সময় গান বাজনা নৃত্য প্রভৃতি হয়। এক শ্রেণীর দরবেশ মহোল্লাসকালে (Ecstasy) রীতিমতো নৃত্য করেন। এ-নৃত্যের চরিত্র কতকটা উপজাতীয় এবং সম্ভবতঃ শিবের তান্ডব নৃত্যের সঙ্গে তুলনীয়। এ-ধরনের নৃত্য গীতে স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ হতে পারে। বাল্যকালে "নাছুইনা" পীরদের আখড়ার কথা শুনেছি। আমাদের গ্রামের মাইল চারেক দূরে এ শ্রেণীর এক পীরের আস্তানা ছিল। বাদ্যভান্ড ও নৃত্যগীত সহকারে জপ বা জিকর করা কালে জ্ঞান লুপ্ত ও ভূপতিত হলে ভক্তের সমাধি বা ফানালাভ হয়। প্রাণবায়ু নির্গত হলে নির্বাণ বা বাকা অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হলো। ভক্ত ও প্রেমিকের জন্যে সেটা চরম সাফল্য। নৃত্যপর দরবেশ (Dancing Darbesh) নামে একটি শ্রেণী আছে।

আগেই বলেছি, প্রধানতঃ সুফী দরবেশ শ্রেণীর লোকদের দ্বারাই এ দেশের সাধারণ সমাজে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। রাজকীয় অনুগ্রহের লোভে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকবেন তারা উচ্চ বর্ণের লোক হওয়াই স্বাভাবিক। এ-কালেও উচ্চ শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর লোকগণই ঘন ঘন দল পরিবর্তন করেন। ভারত আগমনকারী সুফী দরবেশগণ তৎকালীন বিভিন্ন দর্শন ও ধর্ম-মতের সঙ্গে কমবেশি পরিচিত ছিলেন। অনেকের মতে গ্রীক Soph (বোধি) শব্দ হতে আরবি সুফী শব্দের উৎপত্তি। এক বিশেষ মতাবলম্বী দার্শনিকদের সুফী বলা হতো। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ওদের সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন, "·····First comes scepticism, with the sophists, leading to a study of how we know rather than to the attempt to acquire fresh knowledge." (History of Western Philosophy, P. 90).

আল বিরুনী সুফী শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এ বিষয়ের উল্লেখ করছেন। তাঁর নিজ মতে আরবি সাফী (পূত চরিত্র যুবক) শব্দ হতে সুফী শব্দের উৎপত্তি। অনেকে পশমি কম্বল পরিধানকারীদের সঙ্গে 'সুফী' শব্দের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। দর্শন-শাস্ত্র অধীত সুফী সাধকগণ বিভিন্ন তরিকায় বিভক্ত। সুফী সাধক মনসুর এবং সোহরাওয়ার্দ্দীয়া তরিকার প্রবর্তক শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দ্দী ওয়াহদাতুল ওজুদ অর্থাৎ পরম সত্য বা সত্তা মাত্র একটি; এ মতবাদ প্রচারের জন্যে শরিয়তপন্থিগণ কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। জল্লাদের উত্তোলিত তরবারির মুখেও মনসুর চিৎকার করে বলতে থাকেন 'আনাল হক'—ভারতীয় দর্শনের ভাষায় 'আমিই সেই' বা 'তুমিই সেই'। শ্বেতকেতুকে প্রদত্ত উপদেশ স্মরণীয়। (Maxmuller, Six Systems of Indian Philosophy, p. 370). আনাল হকের শাব্দিক অর্থ 'আমি সত্য'। জল্লাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে নিহত হওয়ার পর মনসুর কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে যান। তাঁর রক্তগোশ ত হতেও 'আনাল হক' শব্দদ্বয় নির্গত হতে থাকায় খলিফার আদেশে না কি তার দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়। কিন্তু ছাই বাতাসে উড়তে উড়তেও না কি 'আনাল হক' বলছিল। এটি কাহিনী। উর্দু-ফার্সী কেতাব তার উৎস। এখনও বাংলাদেশের অগণিত লোক এ কাহিনী সত্য জানে বিশ্বাস করে। কাদেরিয়া তরিকার প্রবর্তক আবদুল কাদের জিলানী মাতৃজঠরে থাকাকালে সেখান হতে বের হয়ে এসে না কি তার মা'র প্রতি কুনজরদানকারীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করে পুনরায় মাতৃজঠরে ফিরে যান এবং যথাসময়ে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হন। খাজা মইনুদ্দীন চিশতি নিজামুদ্দীন আউলিয়া প্রমুখ সুফীর কেরামতি সম্পর্কেও এ-দেশে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। অগণিত মুসলমান এ সব কাহিনী বিশ্বাস করে। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বিশ্বাস করে যে, উচ্চমার্গীয় সাধক পুরুষগণের মধ্যে ধর্মভেদ নেই। তারা কেরামতিবলে যখন যেখানে খুশি উপস্থিত হতে পারেন, দরিয়ার উপর দিয়ে খড়ম পায়ে হাঁটতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অষ্টম শতাব্দীর সুফী রাবেয়া বলতেন, "আল্লাহ প্রেমে আমার হৃদয় পূর্ণ। সেখানে অন্যের প্রতি প্রেম বা ঘৃণা এমন কি মোহাম্মদ (দঃ) প্রেমের স্থান নেই। হে আল্লাহ! তুমি আমার হৃদয়কে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ কর।" মাছের ওপর সওয়ার হয়ে 'মাছী সওয়ার' দরবেশের উত্তর বাংলায় প্রবেশের 'কেরামতি' বাংলাদেশে একটি কিংবদন্তী। সুফী দরবেশদের সম্পর্কিত এসব কাহিনী হতে বোঝা যায় ওরা কোন ধরনের মুসলমান ছিলেন অথবা জন-সাধারণ ওদের কোন ধরনের মুসলমানরূপে গ্রহণ করেছিল।

কোরান শরিফে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) একটি কেরামতিরও উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি বাহক বাংলার সাধারণ মানুষের মন ও মানসের উপর ফকীর দরবেশ সুফী সাধকদের যে কী অসাধারণ প্রভাব পড়েছিল, কেরামতি সম্পর্কিত কাহিনীগুলোর উপর আজকের দিনের শুধু নিরক্ষর সাধারণ মানুষের নয় অগণিত শিক্ষিত মানুষের আস্থার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে সব কাজ করেন নি অথবা করতে পারেন নি ভক্তগণ সুফী দরবেশদের দিয়ে সেই অসাধ্য সাধনও করিয়েছেন। আবদুল কাদির জিলানীর কেরামতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মোহাম্মদের (দঃ) বাণীও আবিষ্কার করা হয়েছে। হিন্দু ভক্তগণও সাধু সন্ন্যাসীদের দিয়ে অনুরূপ অসাধ্য সাধন করিয়েছেন। পুরাণে অসংখ্য কাহিনী বিদ্যমান। হিন্দু মিথস এবং গ্রীক মিথস্ এই বিশেষ বিষয়ে বিশেষভাবে রোমাঞ্চকর। ফকীর দরবেশ সাধু সন্ন্যাসীগণ স্থানকাল অতিক্রম করতে পারেন অর্থাৎ ওদের যুগপৎ ঢাকা, মক্কা, লণ্ডন, নিউইয়র্কে দেখা সম্ভব;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছেনও নাকি অনেকে। সাধনার এক বিশেষ স্তরে পৌঁছার পর ওদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকে না, নিছক মানুষ হয়ে যান ঃ ওরা কিছুকাল অন্তর অন্তর পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে কনফারেন্সে মিলিত হয়ে পরবর্তী একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে দুনিয়ার মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন—উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের মুখে আমি এ-সব কথা শুনেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে হাঙ্গেরিতে (না কি ককেসাসে ঠিক মনে নেই) না কি এ-ধরনের একটি কনফারেন্স হয়েছিল, এ-খবরও আমাকে দিয়েছিলেন একজন। বাংলার কোনো প্রতিনিধি ছিল কি না, থাকলে তিনি কে ছিলেন, সেটা তিনি আমাকে বলেন নি। এ-ধরনের অসংখ্য বিশ্বাস এখনও শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে অগণিত বাঙালীর মধ্যে দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ মুসলিম সুফী সাধকগণ এ-দেশে 'মৌল' (যদি মৌল বলে কোনো বিমূর্ত বিষয় থাকে) ইসলাম নিয়ে প্রবেশ করেন নি। অপরদিকে বাংলার জনসাধারণ ধর্মান্তরিত হয়েছে সত্য কিন্তু হাজার হাজার বছর ব্যাপী জীবন-যাপনের মধ্যে সঞ্চিত নানা সংস্কার, বিশ্বাস, জীবনবোধ এবং সামাজিক আচরণের সঙ্গে নতুন ধর্মের সমন্বয় করে নিয়েছে।

বাংলাদেশে যে সকল সুফী দরবেশ এসেছিলেন, এ-কালের লোক সমাজের নানা ধ্যান ধারণা ও আচরণ দৃষ্টে মনে হয় তারা ছিলেন উল্লিখিত দ্বিতীয় মতাবলম্বী অর্থাৎ pantheist school (সর্বেশ্বরবাদ) অথবা তার কোনো সংশোধিত ও পরিবর্তিত শাখা প্রশাখার লোক। ভারতবর্ষে উক্ত বিভিন্ন দার্শনিক মতামতের লড়াই আগেই শুরু হয়েছিল। নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধমত শঙ্করাচার্যের অভিযানের ফলে ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়ছিল। দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন সত্ত্বেও হিন্দুর মানসিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক উন্নতির পথে সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক ছিল তার চতুর্বর্ণীয় সমাজ বিন্যাস। এ বিন্যাস দু'দিক থেকে ক্ষতি করছিল। প্রথমতঃ পেশাকে বর্ণের সঙ্গে চিরস্থায়ী করার ফলে উৎপাদন পদ্ধতি বিশেষ স্থানে স্থানু হয়ে রইল ঃ নতুন কৌশল উদ্ভাবন করার কোনো আগ্রহ ও উদ্যোগ সমাজে রইল না। দ্বিতীয়তঃ অগণিত মানুষ মৌলিক মানবিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছিল। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত দ্বৈতবাদের খিচুড়ি দ্বারা সমস্যার সমাধান হলো না। বৌদ্ধমত হীনবল এবং নবব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও চতুর্বর্ণীয় সমাজ বিন্যাসের দরুণ নির্যাতিত নিপীড়িত ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের মন ও মানস আদি বৌদ্ধমতের প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছিল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, সত্যও নয়। ক্ষোভ ও হতাশা দুই পুঞ্জীভূত হওয়া স্বাভাবিক। পশ্চিম ভারতে মুসলিম আক্রমণ শুরু হওয়ার কালে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিরোধের সম্মুখীন না হওয়া এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে গুরুতর অনৈক্য তৎকালীন হিন্দু সমাজের পতনশীল অবস্থার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

মুসলিম সুফী সাধকদের দু'টি সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ ওরা ছিলেন তৎকালীন তাত্ত্বিক দর্শনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সঙ্গে সুপরিচিত। দ্বিতীয়তঃ তারা বর্ণভেদ কি বস্তু বুঝতেন না অথবা অস্বীকার করতেন। কোরানের বাণী অনুযায়ী মানুষ আল্লাহতায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি—আহসানে তকমীম সর্বোত্তম প্রজাতি—আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, কোরানে মানবজাতির কথাই বলা হয়েছে, বিশেষ কোনো ধর্মাবলম্বী বা বর্ণাবলম্বীর কথা বলা হয়নি। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তত্ত্বীয় ইসলামে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ তো নেই-ই উপরন্তু মানুষের উপরে অন্য কারো স্থান নেই। বাশুলী দেবীর পূজারী চণ্ডীদাস কোরানের উপরোক্ত বাণীসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই হঠাৎ এক মাহেন্দ্রমুহূর্তে "শোনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" উচ্চারণ করেছিলেন কিনা কে জানে!

তত্ত্বীয় বিচারে, ইসলাম ধর্মে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, সুতরাং জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে উচ্চমার্গীয়, মধ্যমার্গীয়, নিম্নমার্গীয় প্রভৃতি সকল স্তর ও প্রকারের চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত। একমাত্র শর্ত নিরাকার সগুণ আল্লাহর অস্তিত্ব মানতে হবে। ভারতবর্ষে নিরাকার একেশ্বরবাদী চিন্তা বিদ্যমান ছিল, এখনও একজন সাধারণ হিন্দু যখন বলে, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করো, তখন সে নিরাকার সগুণ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেই তার প্রার্থনা জানায়, কোনো প্রতীককে (মূর্তিকে) মনে স্থান দেয় না। মুসলিম সুফী সাধকগণ উভয় সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছিলেন বলেই মনে হয়। পীর মুরিদী প্রথা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় প্রেমভক্তিবাদ ও গুরু শিষ্য-বাদেরই ইরানীয় ইসলামী রূপ। নিম্নবর্ণের লোককে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করতে দেয়া হতো না। সংস্কৃত ভাষা শ্রবণও ওদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয় বেদ পাঠ করতে পারলেও কাউকে শিষ্য করার অথবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা-দানের অধিকার তার ছিল না। ব্রাহ্মণ গুরু হতে পারতো, কিন্তু শিষ্যত্বের দ্বার নিম্নবর্ণের সাধারণ লোকের জন্যে বন্ধ ছিল; শূদ্রের পৌরহিত্য করলে ব্রাহ্মণও শূদ্রে পরিণত হতো। শূদ্র ব্রাহ্মণরাই শূদ্রের বাড়ীর পূজা করেন। অপরদিকে সুফী দরবেশ পণ্ডিত হওয়া এবং যে কোনো ভাষা শিক্ষা করা মুসলমান মাত্রেরই জন্মগত অধিকাররূপে স্বীকৃত, বিদ্যা শিক্ষা করা মুসলিম-নরনারীর জন্যে ফরজ অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় কর্ম। ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরও এ-সব অধিকার আছে। মুসলিম সুফী সাধকগণ বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন। বিদ্যা দান এবং মুরীদও করতেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগ পরবর্তী দেবদেবীর সাদৃশ্যও এটাই প্রমাণ করে যে ভারত বিজয়ের পর আর্যদের জন্যে একটি সমন্বিত ধর্ম ও সংস্কৃতি সৃজন রাজনৈতিক দিক থেকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

যে কোনো দেবদেবীর উপাসক কর্মমার্গী হতে পারে ঃ ওরা ফলমূল দুগ্ধ এবং প্রাণী (কখনও কখনও মানুষ) বলিদান করে দেবোপাসনা করত। উপবাস, দানখয়রাত, তীর্থস্থান দর্শন, প্রায়শ্চিত্ত, ত্যাগ তিতিক্ষা প্রভৃতিও দেবতাদের সন্তুষ্ট করে। এসব কর্তব্য পালন করলে ইহকাল ও পরকালে সুখ ও সুবিধালাভ অনিবার্য,—কর্মমার্গীদের এটা বিশ্বাস।

জ্ঞানমার্গ হচ্ছে, চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেকে, বিশ্বকে, প্রকৃতি ও পুরুষকে জানা ও বোঝা। সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ, বেদান্ত, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত তত্ত্বীয় দার্শনিক চিন্তা চিন্তাশীল বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে সীমিত থাকাই স্বাভাবিক। জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানযোগ এবং আরবি মারেফাত অভিন্ন কথা—মারেফাত অর্থ জানা।

প্রথমদিকে ভক্তি ও প্রেমবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তালাভ করে নি। ভগবদ গীতা এবং মহাভারতের নারায়ণী খণ্ড ব্যতীত, মুসলিম আগমনপূর্ব ভারতে উত্তরাঞ্চলীয় হিন্দু ধর্মপুস্তকসমূহের কোথাও ভক্তিবাদের উল্লেখ দেখা যায় না। এ-সম্বন্ধে ডক্টর তারাচাঁদ বলেন, "In mahayana Buddhist lore as well as in Siva. Pancaratra and the Sakta literature Bhakti occupies a very subordinate position to Jnana, The worship of Visnu or Bhagavata and devotion to Amitabha and Siva have an emotional tinge, but they lack the fierce glow of passion and fervour which has a tendency to run riot in wild eroticism or incoherent ecstatism. These are later growths and it is with their history in either of their aspects—a sober and lyrical or Dionysian and explosive—that the following chapter will deal. It will suffice here to say that the trend of religious development in subsequent times is in the direction of emotionalism, of the transformation of affeactions suffusing both will and intellect. The rites and ceremonies remain fixed for all time, the philosophies strike no new paths but devotion finds multitudinous expression and luxuriates in exuberant form". (Tarachand, Influence of Islam on Indian Culture, Indian Press Ltd, Allahabad, 1946, PP. 27-28).

ডক্টর তারাচাদের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায়, মুসলিম আগমন, পরবর্তী বাংলায় ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের বহিরাবরণ অর্থাৎ বাইরের কিছু কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠান হয়তো ঠিক আছে, কি হিন্দু কি মুসলিম কারো দার্শনিক চিন্তা নতুন উপলব্ধি ও নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হয় নি, কিন্তু হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রেম ভক্তিবাদ প্রায় সর্বগ্রাসী শক্তিরূপে বিদ্যমান। পার্থক্য শুধু নামের। মুসলমান আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করে, হিন্দু ব্যবহার করে তৎসম শব্দ। ইরানী মরমী কবিদের সাকী ও শরাব যদি বা প্রতীক কিন্তু মির্জা গালিব সহ বহু কবি রক্তমাংসে গড়া সাকী পরিবেশিত আঙ্গুর রস পান করতেন। শিবের তাণ্ডব নৃত্যই যেন নাম-কীর্তনের আখড়া অথবা জিকিরের খানকায় এসে নতুন অর্থ পরিগ্রহ করেছে।

দক্ষিণ ভারতের রামানুজ নতুন মত প্রচার করলেও চতুর্বর্ণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর পদ্ধতিতে যে ভক্তিগুরুবাদ বিদ্যমান তার সঙ্গে 'ইসলাম' শব্দের মূল অর্থের মিল আছে ঃ ইসলাম শব্দের অর্থ Resignation to the will of God. ডক্টর তারাচাঁদ মন্তব্য করছেন ঃ Historically also there is no insuperable difficulty in supposing that Ramanuja adopted it from Islam.

রামানুজ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ভক্তিবাদ প্রচার করলেও শূদ্রকে বেদ পাঠের অধিকার দেন নি। কিন্তু তার অসংখ্য ভাবশিষ্যের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, নানক এবং বাংলার শ্রীচৈতন্য সংস্কারমুক্ত প্রেমভক্তিবাদী ছিলেন। ওরা রাম রহীমকে—আল্লাহ ও হরিকে পৃথক জ্ঞান করতেন না। ওদের বক্তব্য বোধ করি ছিল, নামে কি আসে যায়। উদ্দিষ্ট ও উদ্দেশ্য মনের ব্যাপার। মুসলিম তন্তুবায় পরিবারে লালিত পালিত কবীর বলেন, "সাধুগণ উভয়ের পথ আমি দেখেছি হিন্দু ও মুসলমানের পথ এক। কবীর বলে রাম ও খোদা অভিন্ন।" শ্রীচৈতন্য, মীরাবাই, তুকারাম, সুরদাস প্রমুখ কবীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলেও একেশ্বরবাদী ছিলেন। কৃষ্ণদাস দু'টি বাক্যে শ্রীচৈতন্য-দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"কৃষ্ণের আরাধনা এবং গুরুর সেবা করলেই জীব মোহমুক্ত হতে পারে এবং কৃষ্ণপদ লাভে সমর্থ হয়। বর্ণাশ্রয়ী ধর্ম ত্যাগ করে খাঁটি বৈষ্ণব বিনা শর্তে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে।"

শ্রীচৈতন্য আচার অনুষ্ঠান শৃঙ্খলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ এবং তার নিন্দা করেন। তাঁর ছিল এক ঈশ্বরে আস্থা। তাঁর মতে, প্রেম ভক্তি নাম-কীর্তন এবং নৃত্যগীতের মধ্যে লব্ধ মহোল্লাসের (Ecstasy) মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন মিলে। কৃষ্ণ বা হরি বলতে এখানে এক ঈশ্বর বোঝায়। কৃষ্ণদাস রচিত শ্রীচৈতন্যের জীবনী এবং যদু ভট্টাচার্য প্রণীত Hindu Castes and Sects গ্রন্থের বরাত দিয়ে ডক্টর তারাচাঁদ বলেন যে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মুসলিম পীরদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগ পরবর্তী দেবদেবীর সাদৃশ্যও এটাই প্রমাণ করে যে ভারত বিজয়ের পর আর্যদের জন্যে একটি সমন্বিত ধর্ম ও সংস্কৃতি সৃজন রাজনৈতিক দিক থেকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

যে কোনো দেবদেবীর উপাসক কর্মমার্গী হতে পারে ঃ ওরা ফলমূল দুগ্ধ এবং প্রাণী (কখনও কখনও মানুষ) বলিদান করে দেবোপাসনা করত। উপবাস, দানখয়রাত, তীর্থস্থান দর্শন, প্রায়শ্চিত্ত, ত্যাগ তিতিক্ষা প্রভৃতিও দেবতাদের সন্তুষ্ট করে। এসব কর্তব্য পালন করলে ইহকাল ও পরকালে সুখ ও সুবিধালাভ অনিবার্য,—কর্মমার্গীদের এটা বিশ্বাস।

জ্ঞানমার্গ হচ্ছে, চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেকে, বিশ্বকে, প্রকৃতি ও পুরুষকে জানা ও বোঝা। সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ, বেদান্ত, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত তত্ত্বীয় দার্শনিক চিন্তা চিন্তাশীল বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে সীমিত থাকাই স্বাভাবিক। জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানযোগ এবং আরবি মারেফাত অভিন্ন কথা—মারেফাত অর্থ জানা।

প্রথমদিকে ভক্তি ও প্রেমবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তালাভ করে নি। ভগবদ গীতা এবং মহাভারতের নারায়ণী খণ্ড ব্যতীত, মুসলিম আগমনপূর্ব ভারতে উত্তরাঞ্চলীয় হিন্দু ধর্মপুস্তকসমূহের কোথাও ভক্তিবাদের উল্লেখ দেখা যায় না। এ-সম্বন্ধে ডক্টর তারাচাঁদ বলেন, "In mahayana Buddhist lore as well as in Siva. Pancaratra and the Sakta literature Bhakti occupies a very subordinate position to Jnana, The worship of Visnu or Bhagavata and devotion to Amitabha and Siva have an emotional tinge, but they lack the fierce glow of passion and fervour which has a tendency to run riot in wild eroticism or incoherent ecstatism. These are later growths and it is with their history in either of their aspects—a sober and lyrical or Dionysian and explosive—that the following chapter will deal. It will suffice here to say that the trend of religious development in subsequent times is in the direction of emotionalism, of the transformation of affeactions suffusing both will and intellect. The rites and ceremonies remain fixed for all time, the philosophies strike no new paths but devotion finds multitudinous expression and luxuriates in exuberant form". (Tarachand, Influence of Islam on Indian Culture, Indian Press Ltd, Allahabad, 1946, PP. 27-28).

ডক্টর তারাচাদের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায়, মুসলিম আগমন, পরবর্তী বাংলায় ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের বহিরাবরণ অর্থাৎ বাইরের কিছু কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠান হয়তো ঠিক আছে, কি হিন্দু কি মুসলিম কারো দার্শনিক চিন্তা নতুন উপলব্ধি ও নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হয় নি, কিন্তু হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রেম ভক্তিবাদ প্রায় সর্বগ্রাসী শক্তিরূপে বিদ্যমান। পার্থক্য শুধু নামের। মুসলমান আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করে, হিন্দু ব্যবহার করে তৎসম শব্দ। ইরানী মরমী কবিদের সাকী ও শরাব যদি বা প্রতীক কিন্তু মির্জা গালিব সহ বহু কবি রক্তমাংসে গড়া সাকী পরিবেশিত আঙ্গুর রস পান করতেন। শিবের তাণ্ডব নৃত্যই যেন নাম-কীর্তনের আখড়া অথবা জিকিরের খানকায় এসে নতুন অর্থ পরিগ্রহ করেছে।

দক্ষিণ ভারতের রামানুজ নতুন মত প্রচার করলেও চতুর্বর্ণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর পদ্ধতিতে যে ভক্তিগুরুবাদ বিদ্যমান তার সঙ্গে 'ইসলাম' শব্দের মূল অর্থের মিল আছে ঃ ইসলাম শব্দের অর্থ Resignation to the will of God. ডক্টর তারাচাঁদ মন্তব্য করছেন ঃ Historically also there is no insuperable difficulty in supposing that Ramanuja adopted it from Islam.

রামানুজ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ভক্তিবাদ প্রচার করলেও শূদ্রকে বেদ পাঠের অধিকার দেন নি। কিন্তু তার অসংখ্য ভাবশিষ্যের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, নানক এবং বাংলার শ্রীচৈতন্য সংস্কারমুক্ত প্রেমভক্তিবাদী ছিলেন। ওরা রাম রহীমকে—আল্লাহ ও হরিকে পৃথক জ্ঞান করতেন না। ওদের বক্তব্য বোধ করি ছিল, নামে কি আসে যায়। উদ্দিষ্ট ও উদ্দেশ্য মনের ব্যাপার। মুসলিম তন্তুবায় পরিবারে লালিত পালিত কবীর বলেন, "সাধুগণ উভয়ের পথ আমি দেখেছি . হিন্দু ও মুসলমানের পথ এক। কবীর বলে রাম ও খোদা অভিন্ন।" শ্রীচৈতন্য, মীরাবাই, তুকারাম, সুরদাস প্রমুখ কবীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলেও একেশ্বরবাদী ছিলেন। কৃষ্ণদাস দু'টি বাক্যে শ্রীচৈতন্য-দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"কৃষ্ণের আরাধনা এবং গুরুর সেবা করলেই জীব মোহমুক্ত হতে পারে এবং কৃষ্ণপদ লাভে সমর্থ হয়। বর্ণাশ্রয়ী ধর্ম ত্যাগ করে খাঁটি বৈষ্ণব বিনা শর্তে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে।"

শ্রীচৈতন্য আচার অনুষ্ঠান শৃঙ্খলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ এবং তার নিন্দা করেন। তাঁর ছিল এক ঈশ্বরে আস্থা। তাঁর মতে, প্রেম ভক্তি নাম-কীর্তন এবং নৃত্যগীতের মধ্যে লব্ধ মহোল্লাসের (Ecstasy) মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন মিলে। কৃষ্ণ বা হরি বলতে এখানে এক ঈশ্বর বোঝায়। কৃষ্ণদাস রচিত শ্রীচৈতন্যের জীবনী এবং যদু ভট্টাচার্য প্রণীত Hindu Castes and Sects গ্রন্থের বরাত দিয়ে ডক্টর তারাচাঁদ বলেন যে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মুসলিম পীরদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা হয়েছিল এবং তিনি যবনদের খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু "Whether he loved the Yavanas or not, it is undoubted that his teaching was affected by the Yavanas ideas."

মোট কথা ওরা সবাই ছিলেন প্রেমভক্তিবাদী। প্রেমভক্তিবাদ মূলতঃ লোক-সংস্কৃতিজাত। রুদ্র প্রকৃতির তাণ্ডবে ভীতি বিহ্বল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অসহায়তাবোধ সম্ভবতঃ এর উৎসভূমি। মুসলিম সুফীবাদ প্রভাবিত এ মতবাদ-ভিত্তিক নানা আন্দোলন হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে উপমহাদেশের সাধারণ মানুষকে অভিন্ন মানবিক সমতলে মিলিত করার পথ প্রশস্ত করে দেয়। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব এর মূল মন্ত্র। এ-মতাবলম্বিগণ আচার অনুষ্ঠান, বর্ণবৈষম্য, আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদ প্রভৃতিতে অবিশ্বাসী। সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার এ আন্দোলন কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল নিম্নবর্ণিত কাহিনীটিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জন মার্শাল ১৬৮৮-৭২ খৃস্টাব্দে ভারত ভ্রমণ করেন। তার দিনপঞ্জী John Marshall in India—Observation on Bengal নামে প্রকাশিত গ্রন্থে প্রাপ্ত কাহিনীটি এই ঃ

"জনৈক হিন্দু ফকীর পিপঁড়েদের খাওয়াচ্ছিলেন। সেখানে জনৈক মুসলমান উপস্থিত হন। তিনি পিপীলিকাদের মধ্যে আহার্য্য বিতরণের কারণ জানতে চাইলেন। হিন্দু ফকীর বললেন, আগামী কাল ঝড়বৃষ্টি হবে। পিপঁড়েগুলো খাদ্যাভাবে মরতে পারে, এ-কথা ভেবে ওদের খাওয়াচ্ছি। মুসলমানটি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এ-কাজের কী প্রতিফল আশা করেন? হিন্দু ফকীর বললেন, এই প্রাণীগুলোকে খাওয়ালে ভগবান খুশি হবেন। মুসলমানটি বললেন, সব অবিশ্বাসী (Heathen) দোজখে যাবে। মুসলমান ব্যতীত অপর কেউ মুক্তি পাবে না। কিছু দিনের মধ্যে উভয়ের মৃত্যু হলো। উক্ত হিন্দু ফকীরকে বেহেশতে অবস্থান করতে দেখে মুসলমানটি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বিধর্মী কেমন করে বেহেশতে এলো আল্লাহ? মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের বলেছেন, মুসলমান ব্যতীত অপর কেউ ত্রাণ পাবে না। হিন্দুরা কটু স্বাদের লোক-Sour and bitter people, আল্লাহতালা জবাব দিলেন, সত্য বটে হিন্দুরা Sour and bitter people. কিন্তু কটু স্বাদের লোকেরা যদি মিষ্টি ফল নিয়ে আসে তা'হলে এখানে ওরা মিষ্টি স্থান পাবে না কেন? আমি কি পুনরায় ওদের কটু বানাব?" স্মরণীয় যে সময়টা আওরঙজেবের রাজত্বকাল। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ কবি Leigh Hunt এর Abou Ben Adhem কবিতাটির সারকথার সঙ্গে উক্ত কাহিনীটি তুলনীয়।

আমার মনে হয়, বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির যে রূপটি আমরা একালেও কম বেশি দেখতে পাই, তার অনেকটাই মুসলিম সুফীবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত প্রেমভক্তিবাদী সংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতি। এ-আন্দোলনকে প্রথাপদ্ধতি এবং আচার নিষ্ঠার বিরুদ্ধে - এমন কি আইন কানুনের বিরুদ্ধেও এক ধরনের গণ-বিদ্রোহ বলা যায়। বাংলার এই লোক-সংস্কৃতির কিছু কিছু স্থূল দিক প্রাচীন লোকায়ত দর্শনের সূত্রগুলো পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়। নিম্নে প্রাচীন লোকায়ত দর্শনের কিছু সূত্র দেয়া হলো।

The pleasure which arises to men from contact with sensible objects,

Is to be relinquished as accompanied by pain - such is the warning of fools.

The berries of paddy, rich with the finest white grains,

What man, seeking his true interest, would fling away, because covered with husks and dust.

The Agnihotra, the three vedas, the three staves (carried by ascetics) and smearing one self with ashes.

They are the mode of life made by their creator (ধাত্রী) for those who are devoid of sense and manliness.

If a victim slain at the Gyotishtoma will go to heaven,

Why not his own father killed there by the sacrificer ?

If the sradh-offerng gives pleasure to beings that are dead,

Then to give viaticum to people who travel here on earth would be useless.

If, those who are in heaven derive pleasure from offerings,

Then why not give food here to people while they are standing on the roof ?

As long as he lives let man live happily ; after borrowing money, let him drink Ghee.

How can there be return of the body after it has once been reduced to ashes ?

If he who has left the body goes to another world,

Why does he not come back again perturbed by love of his relations ?

Therefore funeral ceremonies for the dead were ordered by the Brahmans,

As a means of livelihood, nothing else is known anywhere.

The three makers of the vedas were buffoons, knaves and demons.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The speech of the Pandits is (unintelligible) like Gharphari Turphari.

The obscene act there (at the horse sacrifice) to be performed by the queen has been

Proclaimed by knaves and likewise other things to be taken in hand.

The eating of flesh was likewise ordered by demons.

(Translation by Max Muller in Six Systems of Indian philosophy, pp. 101-102).

এ বিষয়ে পরে আরো কিছু আলোচনা করছি।

চর্যাপদ পরবর্তী বাংলা

শুরুতেই একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চর্যাপদগুলো যখন রচিত হয় তখন বাংলায় বৌদ্ধ এবং হিন্দু রাজাদের শাসন বিদ্যমান। শেষ দিকটায় ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের ব্যাপক পুনঃ-প্রতিষ্ঠা চলছে (সেন রাজাদের শাসনামলে)। অপরদিকে সংখ্যায় যাই হোক মুসলিম সুফী-সাধকগণও বাংলায় প্রবেশ করেছেন। সুতরাং চর্যাপদ রচয়িতাগণ ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম সুফীবাদ সম্বন্ধে আদৌ অবগত ছিলেন না, এমন সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ করা যায় না। তা ছাড়াও সিন্ধু সীমান্ত প্রদেশ সোয়াত পাঞ্জাব আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যোগাযোগ অল্প বিস্তর হলেও থাকার কথা।

চর্যাপদ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের নমুনার মধ্যে রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ এবং কৃত্তিবাস ওঝা অনুবাদিত রামায়ন উল্লেখযোগ্য। শূন্য পুরাণের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা বা কালিমা জালালীতে সাধারণ মানুষের উপর ব্রাহ্মণদের নিপীড়নের বর্ণনার সঙ্গে মুসলমানদের আগমনের উল্লেখ আছে। ডক্টর মুহম্মদ এনামল হকের মতে উক্ত অংশটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকের রচনা। রামাই পণ্ডিতের "হাতে নিয়ে চির কামঠা পায় দিয়া মজা। গৌরে বলান গিয়া ধর্মরাজা" এবং নিরঞ্জন স্বর্গ হতে অবতীর্ণ হয়ে "মুখেতে বলেন দম্মাদার" (দম মাদার) প্রভৃতি অংশ লক্ষ্য করে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, শূন্য পুরাণের এই দ্বিতীয় স্তর ১৪৩৬ খৃস্টাব্দের পরে কোনও সময়ে রচিত হয়ে থাকবে। কেননা ফকীর শাহ বদীউদ্দীন মাদার ১৪৩৬ খৃস্টাব্দে ১২৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। কানপুর জেলার মকনপুর নামক স্থানে তাঁর মাজার আছে। সেখানে প্রতি বৎসর তাঁর মৃত্যুদিবসে মেলা বসে। মাদার শাহর অলৌকিক কেরামতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে বাংলাদেশে বহু গালগল্প প্রচলিত ছিল। মাদার শাহর প্রায় অর্ধ নগ্ন চেলাদেরকে বক্রবংশদন্ড হাতে দম মাদার হাঁক দিয়ে বাংলার পল্লীগ্রামে ভিক্ষা করতে আমি নিজেই দেখেছি। 'দম মাদার' ধ্বনি শুনলে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের হৃৎকম্প উপস্থিত হতো। বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে দু'চারটা বক্র বাঁশ দেখলে সেটা মাদারের ঝাড়রূপে গণ্য হতো। মাদারের বাঁশ ঝাড়ের বাঁশ কাটলে পেট ফুলে বা কিডনি ফেটে মৃত্যু অনিবার্য জ্ঞান করা হতো। বাল্যকালের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। খুব সম্ভব ১৯১৯ সালের কথা। পার্শ্ববর্তী গ্রামে একটি মাদারের বাঁশঝাড় ছিল। ঝাড়টিতে ছিল বহু সংখ্যক বাঁশ। বাবা ছোটখাটো আলেম ছিলেন। কিন্তু কুসংস্কার বিরোধী ছিলেন। বাঁশ ঝাড়টি যাদের জমিতে ছিল বাবা ওদের জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কেটে নিতে চাইলে ওদের কোনো আপত্তি আছে কি না? ওরা বলল, নিজের জান বাজি রেখে নিতে পারেন। বাবা লোকজন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাঁশগুলো নিয়ে আসেন। প্রথম বক্রবাঁশটির গোড়া তিনি নিজে কেটে ছিলেন। মাদার শাহ কোন্ মতাবলম্বী সুফী ছিলেন তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বাল্যকালে দৃষ্ট মাদারিয়া ফকীরদের আচার আচরণ ও চলাফেরার মধ্যে শরিয়তানুবর্তিতা দেখিনি। মনে হয় ওরা বাউলদের কোনো শাখাভুক্ত ছিলেন।

অপরদিকে গৌড়ের সুলতানের আনুকূল্যেই কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ অনুবাদ করেন। এ-রচনাও পঞ্চদশ শতাব্দীর। চণ্ডীদাসও পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। সেকালের প্রায় সব কবিই গৌড়ের স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষিত ছিলেন। মনসামঙ্গল রচয়িতা বিজয় গুপ্ত ঐ শতকেই কাব্য রচনা করে সুলতানদের প্রশংসা অর্জন করেন। হুসেনশাহী বংশের (১৪৯৩-১৫৩৮) রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য রচনা বাংলার প্রথম বিদ্যাসুন্দর কাহিনী, মনসা-মঙ্গল এবং ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলী। এগুলোর প্রায় সবই এখন লোক-কাহিনী বা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবও এ সময়ে (১৪৮৫-১৫৩৮)। প্রথম বাঙালী মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীরও সে সময়ের কবি। এখানে অন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করছি। ইবনে বতুতার পরিভ্রমণকালে (১৩৪৫-৪৬) 'বাঙালাহ' বলতে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গকেই বুঝাত। ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে সে সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা বাঙালীরূপে পরিচিত ছিল। সোনারগাও সুলতান ফখরুদ্দীনের রাজধানী ছিল। সুলতান হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহর রাজত্বকালে (১৩৫৩-১৩৫৯) বাংলা ও বাঙালী নাম উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গেও বিস্তৃতি লাভ করে। লক্ষণাবতি ও বাঙ্গালা একত্র হয়ে যায়। সুলতান এই যুক্ত অঞ্চলকে 'বাঙালা' এবং তার অধিবাসীদেরকে বাঙালী নাম দেন। হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজে 'শাহ্-ই বাঙ্গালাহ' ও 'শাহ-ই-বাঙালী' উপাধি গ্রহণ করেন। তার প্রধান অমাত্যবর্গ ও সৈনিকগণের উপাধি ছিল রায়ানই-বাঙ্গালাহ, লস্করই বাঙ্গালাহ, পাইক-ই বাঙ্গালাহ ইত্যাদি। (ডক্টর আব্দুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ.-৪)।

উক্ত ঐতিহাসিক তথ্যাবলী প্রমাণ করে যে, চর্যাপদ রচনা-পরবর্তী কম-পক্ষে আড়াই শ' বৎসরকাল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রটি প্রায় অনাবাদী ছিল। ঐ সময়মধ্যে রচিত কোনো উল্লেখযোগ্য বাংলাগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানি না। এর কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, ব্যাপক অশিক্ষা, দেশীয় ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণদের বিরূপতা প্রভৃতির যে কোনো একটি অথবা সব কটি হতে পারে। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের লোকদের মধ্যে খুব কম লোকই লেখাপড়ার চর্চা করত। সুতরাং কে করবে বাংলা ভাষার চচা। মুসলিম সুফী দরবেশ শ্রেণীর প্রচারকদের অধিক সংখ্যায় আগমন ও খানকা স্থাপন, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে যুগপৎ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন এবং বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক ও একনিষ্ঠ চর্চা দৃষ্টে আমরা দু'টি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। প্রথমতঃ সুফীবাদী ইসলাম এবং আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত মানবিক আবেদনমূলক সংশোধিত হিন্দুত্ব এই উভয় শ্রেণীর ধর্মীয় বোধের (আন্দোলন) প্রতি গৌড়ের মুসলিম সুলতানগণ প্রসন্ন ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধ এবং মানব কল্যাণের লক্ষ্য এ দু'টির যে কোনো একটি অথবা দুই গৌড়ের মুসলিম সুলতানদেরকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমন্বিত সামাজিক জীবনবোধ তথা লৌকিক সংস্কৃতি নির্মাণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সজাগ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ সে চেতনা বিদ্যমান থাকার কারণেই তারা দেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রতি দরদমন্দ হয়েছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যই যে জাতিগঠন তথা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রধান উপাদান তারা হয়তো এটাও উপলব্ধি করেছিলেন। সংস্কৃতি এমন কি লোক-সংস্কৃতি চর্চার প্রধান উপাদান ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যম শক্তিশালী ভাষা ও তার লিখিত অলিখিত সাহিত্য (উপকথা, লোক-কাহিনী, ব্যালাড প্রভৃতি)। বাংলার মুসলিম সুলতানগণ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করতে চাননি। তারা বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলকে একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা এবং তার উপর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে চেয়েছিলেন। সকল ধর্ম ও শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমন্বিত জীবনবোধ সৃষ্টি করতে না পারলে রাজ্য ও রাজত্ব স্থায়ী হয় না। আমাদের কালেও আমরা তা' দেখতে পাচ্ছি। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ সম্ভবতঃ এই জাতিগঠনমূলক কাজেই হাত দিয়েছিলেন। একটি প্রায় সর্বকালীন সত্যের উল্লেখ করছি। সেটি হলো, শাসক শ্রেণীর বাহ্যিক পরিচয় যাই হোক তাদের কোনো স্থবির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস নেই। যে কোনো উপায়ে বা পদ্ধতিতে শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিবৃদ্ধিই তাদের একমাত্র ধর্ম।

তাই আমি স্বাধীন সুলতানী শাসনামলকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং একালে আমাদের পরিচিত বাংলার লোক-সংস্কৃতির সৃজনকাল বা উন্মেষকাল বলতে চাই। আমার মতে বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমল বাঙালী জাতির অতীত ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়।

বঙ্গে মুসলিম শাসন পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠালাভের পর হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা লেখকগণ রচিত লিখিত কাব্য এবং মৌখিকভাবে রচিত ব্যালাডের বিষয়বস্তু যাই হোক তার মধ্যে মস্তিষ্কে কীলকের ন্যায় প্রবিষ্ট উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রায় কোথাও নেই। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ময়মনসিংহ গীতিকা তার প্রমাণ বহন করছে। আমার মনে হয় বাংলার অধিকাংশ পালাগান এবং আঞ্চলিক গীতবাদ্য ঐ সময়েরই অবদান। ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, কীর্তন, মেয়েলি, জারি, কবিগান, বাউল, মুর্শিদী, মারফতি প্রভৃতি এমন কি বাদ্যযন্ত্রাদির কিছু কিছু এ সময়েরই সৃষ্টি। ভাটিয়ালী তো সমগ্র বাংলাদেশেরই সুর। বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে মনে হয় বাঁশের বাঁশি আদিম এবং তারপরেই একতারা দোতারা মন্দিরা। বলা বাহুল্য, গীত গান কাহিনী, এমন কি সুরও ভাষাজাত। বাংলা সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছে ঐ সময়ে। এ সময়েরই কবি চণ্ডীদাস বলছেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাস বলেছিলেন, "Man is the measure of all things", মানুষ সব বস্তুর পরিমাপ। চণ্ডীদাসের উক্তি তার চেয়ে স্পষ্ট এবং দৃপ্ত ঘোষণা। অপরদিকে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশে ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃষ্ণ প্রমুখকে অবতার বা নবী এবং ঋক, যজু, সাম এবং অথর্ব এই চারটি আসমানী কেতাবের প্রাপকরূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কোরানে আছে, পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যাদের কাছে নবী এবং তাদের নিজ ভাষায় কেতাব প্রেরণ করা হয় নি। সৈয়দ সুলতান ঐ সূত্র অবলম্বন করেই হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। সৈয়দ সুলতান নিজেও ছিলেন সুফী মতাবলম্বী পীর। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "বাংলাদেশে ইসলামের সুফীমত বেশী প্রসার লাভ করে। সুফীমতের ইসলামের সহিত বাঙালীর মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। সুফীমতের ইসলাম সহজেই বাঙালীর প্রচলিত যোগমার্গ এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।" আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে, "আধ্যাত্মিক ও মারফতী সাহিত্যে ইরানের সুফী প্রভাবও রয়েছে এবং বাউল মুর্শিদী সাহিত্য ছাড়াও নিছক দার্শনিক তত্ত্ব এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম মেলে না। বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ের কারণ বোধ হয় এই যে, মানুষের হৃদয়ানুভূতিতে ও মননে এমন একটি স্তর আছে যেখানে সব ভেদাভেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের সাধকগণ অতিমাত্রায় আচারবর্জিত ও মর্মনিষ্ঠ। তাই এমন নির্বিচার সমন্বয় সম্ভব হয়েছে।" (উদ্ধৃতি, আহমদ শরীফ রচিত বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, ১৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা হতে গৃহীত)। সাহিত্য-বিশারদের মন্তব্যের সাথে এটুকু যোগ করা চলে যে, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ আদিবাসী নির্বিশেষে পল্লী বাংলার কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে সমন্বিত সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। সুফী, সাধক সন্ন্যাসী এবং ধর্ম-সংস্কারকগণ সেই পরিবেশগত বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন মাত্র। "মানুষের ধর্ম" বক্তৃতামালার একস্থানে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত মধ্যযুগের ভারতীয় কবি রজ্জবের দু'টি পঙক্তি স্মরণীয়। রজ্জব বলছেন, "সব সাচ মিলে সো সাঁচ হৈ, না মিলে সো ঝুঁট। জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝিভাবই রূঠ"—"সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।" (রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ)

একই ভাষাভাষী বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী এবং ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক যখন একই গ্রামে, এক পরিবেশ ও উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে বসবাস করে তখন "সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে" তেমন সত্যকে অবলম্বন করেই জীবনযাপন করতে হয়। শুধু বাংলার নয় পৃথিবীর সকল অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতিই প্রকৃতপক্ষে সব সত্যের সমন্বিত রূপ। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উক্ত সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তার মধ্যে বহু কনট্রাডিকশন—এমন কি বহু অসত্যও খুঁজে পাবেন। কিন্তু পল্লীবাসী নিরক্ষর মানুষ সেগুলো নিয়েই আনন্দে জীবন যাপন করে। বাংলাদেশে সব সত্যের সমন্বয় কখনও কখনও হাস্যকর রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার কিছু দৃষ্টান্তঃ কামার কুমোর গোয়ালা, খেয়াঘাটের মাঝি, কৈবর্ত (জেলে সম্প্রদায়), চিড়া, মুড়ি মুড়কি বাতাসা বিক্রেতা, ধোপা, নাপিত প্রায় ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, কিন্তু ১৯৩৭-৪৭ এর ঘোর সাম্প্রদায়িকতার যুগেও ওরা ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের কাজ করত—এখনও করে। পুকুর, দিঘি, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে ব্রাহ্মণ শূদ্র মুসলমান নির্বিশেষে এক সঙ্গে স্নান করে, ওসব জলাশয়ের পানি কিছুকাল পূর্বেও সকলের পানীয় জল ছিল, কারো জাত তার ফলে যায় নি। কিন্তু শূদ্র বা মুসলমানের ঘরের পানি ব্রাহ্মণ পান করবে না। মুসলমান গরু পালে এবং নিজ হস্তে দোহন করে। সেই দুধ ব্রাহ্মণ ক্রয় এবং পান করে। কিন্তু মুসলমানের হুঁকোয় তামাক টানার সময় ব্রাহ্মণ হুঁকোর জল ফেলে দেয়। বলা বাহুল্য নারকেলের হুঁকোর মুখ চুম্বন করতে তার বাধে না। বাজুইনা (বাদ্যকর) শ্রেণীটি ছিল মুসলমান। হিন্দু বাড়ীর রোশনচৌকিতে ওরাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসত। কলু সম্প্রদায়টিও মুসলমান। কলুর ঘানিতে সরষে পিষ্ট হওয়ার সময় কলুগৃহিণী জল ছিটিয়ে দেয়। তেলের বোতল ভরার সময় তেলের ঘটিতে হাত ডুবিয়ে দেয় মুসলমান কলু। ঐ তেলে ব্রাহ্মণী রান্না করেন।

একদিকে ইসলামের সাম্য মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের নীতি প্রভাবিত নদীয়ার শ্রীচৈতন্য চতুর্বর্ণীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অস্বীকার করে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের বোধগম্য ও পালনযোগ্য আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত এক প্রেম ভক্তিবাদী মানবিক ধর্ম প্রচারে অবতীর্ণ। অপর দিকে চিশতীয়া, কাদেরীয়া, সোহরাওয়ার্দ্দীয়া প্রভৃতি তরিকার অথবা ঐ সকল তরিকার দ্বারা প্রভাবিত সুফী দরবেশগণ কতকটা শ্রীচৈতন্যেরই মতো যথাসম্ভব আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত সর্বেশ্বর-বাদী (Pantheist) দর্শন প্রভাবিত সংশোধিত ইসলাম প্রচার করছেন। চৈতন্য-ভক্তগণ নৃত্যগীত সহকারে নামকীর্তন করতে করতে সমাধি ও মোক্ষলাভ করছে। পীর দরবেশদের খানকা দরগাহতেও সকল শ্রেণীর লোক কোথাও বিনা নৃত্যবাদ্যে কোথাও নৃত্যবাদ্য সহকারে জিকর করতে করতে 'ফানা' ও 'বাকা' লাভ করছে। খাজা মইনুদ্দীন চিশতী নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহয় এখনও গীতবাদ্য হয়। বাংলার বহু খানকা দরগাহতেও জিকরের সঙ্গে বাদ্য বাজে। চৈতন্যের তিনজন প্রধান শিষ্য মুসলমান ছিলেন। এই সেদিনও মুসলমান বাউল ছিল। শুধু তাই নয় জীবিত পীরের পদযুগলে এবং মৃতপীরের কবরে প্রণিপাত হয়ে ধর্ণা দিতেও দেখা যায় বহু শিক্ষিত মুসল-মানকে। হিন্দু দেবমন্দির এবং তীর্থস্থানের জন্যে মানত করে। মুসলমান খানকা, দরগাহে, মসজিদের জন্যে মানত করে। ওরস তো ধর্মমেলারই মুসলমানী সংস্করণ।

পূর্বকথায় ফিরে যাওয়া যাক। মুসলিম শাসনামলেই ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা কবিদের সাক্ষাৎ পাই। গৌরের সুলতান কর্তৃক পুনর্বাসিত আরাকান রাজসভায় কাব্য চর্চা করেছেন কাজী দৌলত, মাগন ঠাকুর, আলাউল প্রমুখঃ বাংলায় আব্দুল হাকিম, ভারতচন্দ্র এবং আরো অনেকে। আলাউল অনুবাদ করলেন মালিক মোহাম্মদ জায়সীর প্রেমোপাখ্যান পদ্মাবতী। ভারতচন্দ্র তাঁর ভাষায় নতুন করে পরিবেশন করলেন সেকালের পর্ণোগ্রাফি বিদ্যাসুন্দর। ব্রাহ্মণ সন্তান চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর প্রেমে আত্মহারা। বাংলা সাহিত্য শুধু শক্তি-লাভ করছে না, বাস্তব জগতের মানুষের স্তরে নেমে আসছে। কখনও ধর্মের আচ্ছাদনে কখনও বা ইহজগতের ভাষায় নিরাভরণ সাদামাটা সাধারণ মানুষের ইহজাগতিক জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ নিরানন্দের কথা বলা হচ্ছে। চণ্ডীদাস, রামী, বিদ্যাসুন্দর, মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও লীলা, দেওয়ানা মদীনা প্রভৃতি Ballad লোককাব্যে জাত ধর্ম বর্ণ একাকার হয়ে গড়ে উঠছে বাঙালীর সমন্বিত লোক সংস্কৃতি। "ব্রাহ্মণ কুমার হৈল চণ্ডালের পুত" এবং পরে মুসলমান "পীরের অদ্ভুত কাণ্ড সকলি দেখিয়া কঙ্কের পরান গেল মোহিত হইয়া"..."তারপর জাতি ধর্ম সকলি ভুলিয়া পীরের প্রসাদ খায় অমৃত বলিয়া।" ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন "পূর্ব মৈমনসিংহে সেন রাজ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রভাব পৌঁছায় নাই। এই জন্যে সপ্তদশ এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ছড়াগুলিতেও আমরা ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অথবা সংস্কৃতের আনুগত্য বিশেষরূপে দেখিতে পাই না। পূর্ব ময়মনসিংহের সাহিত্য বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের সাহিত্যের মত নহে। এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙালীর ঘরগুলিকে এতটা আঁটাআঁটি করিয়া বাঁধে নাই। এখানে পাষাণচাপা অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের সৃষ্টি নাই। এখানে ঘরের জিনিসকে শিকল দিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায় নাই এবং রমণীদের জন্য পিঁজরা তৈরী হয় নাই। ....এই জন্য গীতিকাগুলির সর্বত্র দেখা যায় পুরুষ নারী নিজেরা বিবাহের পূর্বে পরস্পরকে আত্মদান করিয়াছেন, তারপর বিবাহ হইয়াছে।" ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলোর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য এই যে, মুসলিম আমলে রচিত পালাগুলোতেও হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষকে মানুষের দোষগুণে ভূষিত করা হয়েছে। দরিদ্র ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি এবং ধর্মান্ধ সমাজপতি ও জালেম শাসকশ্রেণীর প্রতি লেখকের ঘৃণাকে যদি সমাজ সচেতনতা নাম দেয়া যায় তা'হলে ওসব রচয়িতাগণ অবশ্যই সমাজ সচেতন মানবতাবাদী লেখক ছিলেন। কাহিনীগুলো লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং বাঙালীর সমন্বিত লোক-সংস্কৃতিজাত।

বাংলাভাষাভাষী সকল অঞ্চলের ব্যালাড (Ballad) সংগৃহীত হয় নি। আমার মনে হয় সমগ্র বঙ্গের ব্যালাড সংগৃহীত হলে তার মধ্যেও ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনীর মতো একান্ত মানবিক কাহিনী বহু খুঁজে পাওয়া যাবে। ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার ঝুলি, রেভারেণ্ড লাল বিহারীদের Folk Tales of Bengal প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত কাহিনীগুলো তার প্রমাণ।

নৌকার হাল ধরে মাঝি যখন ভাটিয়ালিতে গান ধরছে, "জলভর বিরলরে কন্যা জলে দিয়া ঢেউ" অথবা পাট ক্ষেত নিড়ানির যোগালিয়ারা যখন সমবেত কণ্ঠে গাইছে, "ধরিয়া চালের কোণা কান্দন করে গো বালি (বালিকা) ও বন্ধু দাঁড়াওরে আইজ তোরে দেইখা লই জনমের তরেরে বন্ধু" তখন তারা জাতধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পল্লী বাংলার সমন্বিত সামাজিক জীবনের রূপটিই নিপুণ চিত্রকরের ন্যায়ে আমাদের সামনে তুলে ধরছে। নির্মিত হচ্ছে বাংলার লোক সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতি। ভারতবর্ষকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণকারী দেশীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার প্রথম মুসলিম কবি আমীর খসরু (ত্রয়োদশ শতাব্দী) লিখলেন, "জ হাল মিশ্‌কীন সকুন ত গাফুল দুয়ারে নৈনা বনায়ে বাতিয়াঁ,...সখি পিয়া কোজো ন দেখুতো কৈসে কাটু অধেরে রাতিয়া।" ডক্‌টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে "খোসরৌর হিন্দ রচনা মধ্যযুগে লিখিত হইলেও এ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার কিংবা রাজরাজড়ার যুদ্ধে পর্যবসিত হয় নি। হিন্দীতে তাহার যে রচনা পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে গভীর তত্ত্ব নিরূপণ নাই বা জীবনের উদ্দেশ্য নিয়াও কোন লেখা হয় নি। ইনি কেবল লোকের চিত্ত বিনোদনের জন্যই লিখিয়াছেন এবং হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।" আমীর খসরুর অনুসরণে বাঙালী জাতীয়তা-বাদের বুনিয়াদ তৈরী করছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০)। তিনি লিখেছেন,

যে সবে বঙেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে-সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।
মাতা পিতামহক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ হিত অতি।

এই দৃপ্ত ঘোষণার আগে কবি জানাচ্ছেন,

যেই দেশে যেই বাক্যে কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন
সর্ব বাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিদুয়ানী
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী
ফারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিদুর অক্ষর হিংসে সে সবেগণ।

এখানে মারফত শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। মারিফত শব্দের অর্থ জ্ঞান। রচনার সময়টা বাদশাহ শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট অনুকূল না হলে কবি আবদুল হাকিম বাংলাভাষা বিরোধীদের বেজন্মা বলে পার পেতেন না।

সম্রাট আকবরের আমলে নখশবন্দীয়া তরিকার অনুসারী শেখ আহমদ শরহিন্দী এবং আওরঙ্গজেব পরবর্তীকালে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ওয়াহদতুল ওজুদ অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) ঘোরতর বিরুদ্ধতা করে নির্ভেজাল শরিয়তী ইসলাম অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) যুগের fundamentalist ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ভারতে ইসলামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুকুমত রক্ষার জন্যে আহম্মদ শা আবদালিকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি মারহাট্টা শক্তির কোমর ভেঙে দেন ঠিকই। কিন্তু 'ইসলামী হুকুমত' প্রতিষ্ঠার জন্যে অবস্থান করেন নি, উল্টো বরং দিল্লীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে ফিরে যান। বস্তুতঃ উপমহাদেশের কোথাও সে চেষ্টা সফল হওয়ার প্রমাণ নেই। তথাকথিত ফাণ্ডামেন্টালিস্টরাও বহু শরিয়ত বহির্ভূত কাজকর্ম অবলীলাক্রমে করে থাকেন। শিয়া সুন্নী দাঙ্গাও হয়। আবার অসংখ্য সুন্নী মুসলমান মহরমের মাতমে শামিল হন এবং নফল রোজা করেন। শিয়ারা তাজিয়া নিয়ে যা করেন তার সঙ্গে দশহরার দিন দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সাদৃশ্য নেই এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। উপমহাদেশের বাইরের মুসলিম সমাজে "মৌলুদ শরিফ" নামের কোনো পুণ্যকর্ম করার রেওয়াজ নেই। বাংলার সর্বত্র সম্বৎসর মৌলুদের জলসা হয়। ও-সব জলসায় প্রায় ক্ষেত্রে শোনানো হয় নানা অলীক আজগৈবী এমন কি সুরুচিবিরুদ্ধ গাল্পগল্প। সবশেষে হাজিরানে মজলিসে উপস্থিত বলে ঘোষিত রসুলুল্লাহর রুহের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে দাঁড়িয়ে কতকটা গানের সুরে সালাম পড়া হয়। প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছি যে fundamental বলে কোনো বস্তু মানবজাতির সামাজিক জীবনে কোন কালে ছিল না, সুতরাং তার পুনঃপ্রবর্তন প্রচেষ্টাও সাফল্যমন্ডিত হওয়ার নয়। বাংলায়ও যে সে-চেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হয় নি, তার প্রমাণ ঢাকা হাইকোর্ট এবং মীরপুরের দরগাহ সহ বাংলাদেশের অগণিত "গরম" দরগাহ মাজার, খানকাহ, দরবার "শরীফ" প্রভৃতির জৌলসী বিদ্যমানতা এবং হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালীর সমাজে পীরমুরিদী গুরু শিষ্যগিরি ব্যবসার ব্যাপকতা। এমন কি নখসবন্দীয়া তরিকা এবং ওয়াহাবী ফান্ডামেন্টালিস্টদের মধ্যেও অনতিকাল মধ্যে গুরু শিষ্য কাল্ট প্রবেশ করতে দেখা যায়। শরীয়তুল্লাহর পুত্র হয়ে গেলেন পীর দুদু মিয়া। রাজ-রাজড়া জমিদার তালুকদারদের ভূসম্পত্তির মতো পীরগিরি গুরুগিরিও উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ তছরূপ করা যায় এবং তাই চলছে। একবার একজন পীর হতে পারলে হয়। তারপর পুরুষানুক্রমে ইহজগতে ধনসমাগম এবং পরকালে বেহেশত নিশ্চিত। পীর হিসেবেই দুদু মিঞা জালেম নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে-ছিলেন। তিতুমীরও ছিলেন পীর।

উপরিউক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আমরা একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি। সেটি হলো বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী সাড়ে পাঁচ শত বৎসরব্যাপী মুসলিম শাসনামলে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের মানবগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে একটি অবিভাজ্য জাতি হিসাবে গড়ে উঠছে এবং তার জাতীয় লোক-সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্যও ক্রমে ক্রমে সৃজিত ও পূর্ণতালাভ করছে। এই সাড়ে পাঁচশত বৎ-সরকালকে বাংলার লোক-সংস্কৃতির বৈপ্লবিক যুগ বলা যায়। এ বিপ্লব কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখিত রচনা অবলম্বনে, কখনও বা অজ্ঞাত অখ্যাত কথক গায়েন বয়াতী কবি-য়াল জারিয়াল বাউল বৈরাগী ফকীর দরবেশ সাধু সন্ন্যাসীর জীবনবোধ, আচার আচরণ এবং মৌলিক রচনাবলী অবলম্বনে ধীরে ধীরে সাধিত হয়েছে। এই সাড়ে পাঁচ শত বৎসরকালকে জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক সমীকরণের যুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ সময়ের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে দু'টি লক্ষণ বেশ সুস্পষ্ট। প্রথমত, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ আদিবাসী নির্বিশেষে পল্লীর সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে কঠোর বিধিবিধান, সংবলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি উদাসীনতা দৃষ্ট হয়। ভক্তিবাদ, প্রেমবাদ, গুরুবাদ প্রভৃতির মধ্যে ধর্মকে সহজ করা হয়েছে। প্রেমবাদ এক পর্যায়ে গিয়ে যৌন সহজিয়াবাদে পৌঁছেছে। পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় দার্শনিক তত্ত্ব সরলীকৃত হয়েছে ঃ সৃষ্টির উৎসরূপে যৌন মিলনকে ঐশ্বরিক মিলন বা তার প্রাথমিক স্তররূপে গণ্য করেছে একটি শ্রেণী। দ্বিতীয়তঃ আনুষ্ঠানিক ধর্ম কর্মের প্রতি এ ঔদাস্য এস্টাবলিশম্যান্ট এবং স্টেটাসকোর (স্থিতাবস্থা) প্রতি একপ্রকার প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহও বটে। এ বিদ্রোহকে হিন্দু মুসলিম উভয় প্রকারের ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি গণ-মানুষের অঘোষিত বিদ্রোহরূপে গণ্য করা যেতে পারে। মুসলিম ব্রাহ্মণ্যবাদ বলতে আমি মুসলিম সমাজের আশরাফ আতরাফ ভেদ এবং মোল্লাকি প্রথাকে বোঝাতে চাই। এ বিদ্রোহের প্রেরণা এসেছে অভিন্ন প্রতিবেশ ও ইকনমির মধ্যে সহ-অবস্থানরত পল্লীবাসীর সহজাত মানসিক চেতনা হতে। এই মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই পল্লীকবিরা ব্যালাড রচনা করেছেন, গায়কেরা গান গেয়েছেন, কথকেরা কথকতার মজলিসকে আনন্দিত করেছেন। পল্লীবাসীরা সেগুলো শুনে কখনও বীররসে, কখনও ভক্তিরসে, কখনও প্রেমরসে আপ্লুত হয়েছেন। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, উক্ত সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের মুসলিম শাসনামলে সৃজনশীল বাংলার লোক-সংস্কৃতি ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলার সাধারণ মানুষের যৌথ কর্ম-জীবন এবং সামাজিক চিন্তার ফসল ঃ তাদের নানা বিচিত্র এমন কি কখনও কখনও পরস্পরবিরুদ্ধ ধ্যান ধারণার সিনথিসিস। বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে বহুল প্রচলিত লোক কাহিনীর অধিকাংশই মানব মানবীর কাহিনী, তাদের বিরহ মিলনের, বীরত্বের ব্যর্থতার এবং আশা-নিরাশার ইতিবৃত্ত। তাদের হাতে পড়ে দেবদেবী ভূতপেত্নী জিনপরীরাও মানব-মানবী হয়ে পড়েছে। রাজপুত্র, উজিরপুত্র, কোটালপুত্র, দেওদানবের কারাগারে বন্দিনী রূপসী রাজকন্যার কাহিনীগুলোর মধ্যে কোথাও বর্ণভেদ, ধর্মভেদ জনিত সংকট দেখতে পাওয়া যায় না। আকবর তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থপ্রসূত নবধর্ম দ্বারা যে মিলন ঘটাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেননি, বাংলার সুফী দরবেশ সাধু সন্ন্যাসী বাউল বৈরাগীরা মিলে তাই ঘটিয়েছিলেন। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এখনও বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের গান বাজনা তাল সুর লয় এবং নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র অভিন্ন। নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠান এবং মৃতের সৎকার প্রভৃতি ব্যতিরেকে বাকী সকল প্রকার আনন্দোৎসব মেলা প্রভৃতিতে সকলে একত্রিত হয়। লাঠি খেলা, তরবারি ও রামদার খেলা, হাডুডু ও দাইড়া খেলা প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্রীড়া। বাসগৃহের নির্মাণ-কৌশল, ভিতরের আসবাব, নকশি কাঁথা, শয্যা, তৈজসপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র সবকিছু অভিন্ন। এক মাঠের জমিতে সকলে পাশাপাশি চাষ করে এবং একই ফসল ফলায়। উৎপাদন পদ্ধতিও অভিন্ন। ধর্মীয় বিধানে বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ কয়েকটি দ্রব্য ব্যতিরেকে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালীর খাদ্য তালিকা ও পাক প্রণালী অভিন্ন। বারবণিতা এবং বারবণিতালয়ে যারা যাতায়াত করেন তাদের জাতকুল ধর্মভেদ নেই। সেখানে স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতার ছুঁতমার্গ অনুপস্থিত। অভিজাত শ্রেণীর দরবারি পোশাক ছিল। ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাকী সকল বাঙালী পল্লীবাসীর পোশাক পরিচ্ছদ ছিল নেংটি, গামছা, ধুতি, চাদর, লুংগি, ফতুয়া, খড়ম ইত্যাদি। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালী পল্লীবাসীর পোশাক পরিচ্ছদ অলংকারপত্র প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি আগেও অভিন্ন ছিল, কিঞ্চিৎ উন্নতির পর এখনও অভিন্ন আছে। লালন ফকীরের সেই বিখ্যাত গানটি প্রসঙ্গত স্মরণীয় যেটিতে তিনি বলেছেন,

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারী লোকের কি হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনী চিনি কি ধরে।
কেউ মালা কেউ তসবী গলায়, তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়, জেতের চিহ্ন রয় কাররে।
গর্তে গেলে কুপজল কয়, গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়,
মূলে একজল, সে যে ভিন্ন নয়, ভিন্ন পাত্র অনুসারে।
জগৎ বেড়ে জেতের কথা, গৌরব করে যথা তথা,
লালন বলে সে জেতের খাতা বিকিয়েছে সদ বাজারে।

পল্লীবাংলার সংখ্যা গণনা পদ্ধতি হাত-পা'র অঙুলি সংখ্যার যোগফল এবং হস্তাঙ্গুলির তিনটি বিভাজনরেখা ও অগ্রভাগের যোগফলের উপর ভিত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রচিত। আর্থ-সামাজিক কাঠামোও এক। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিয়ে শাদি প্রভৃতি উৎসবে পালিত বহু আচার আচরণ প্রাগৈতিহাসিক সমাজ হতে আগত। ধান দুর্বা দিয়ে বধূ-বরণ প্রথা নিঃসন্দেহে প্রাচীন ফার্টিলিটি কাল্টের অবশেষ। হলুদগিলা দিয়ে বরবধূকে স্নান করানো, বাসর ঘরে বরবধূর কার্যকলাপ বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখার রেওয়াজ, শালী ভগ্নিপতি, দাদা নানা নাতনী নাত বৌর মধ্যে আদি রসাত্মক ঠাট্টামস্করা প্রভৃতির মধ্যে ধর্মবোধের লেশ মাত্র নেই। এ রেওয়াজও সম্ভবতঃ আদিম মানব সমাজ হতে আগত। সকালে দোকানীর বউনি বা 'সাইট' করার প্রথাটিও সম্ভবতঃ বহু প্রাচীন কালের। ফসল উৎপাদন,রোগ নিরাময়, ভূতপেত্নী জিনপরীর কবল হতে উদ্ধার, নজর লাগার প্রতিকার, শিলাবৃষ্টি ও ঝড় প্রতিহতকরণ, বশীকরণ প্রভৃতি সম্পর্কিত জাদুমন্ত্র টোটকা প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলার সকল শ্রেণীর পল্লীবাসীর মধ্যে কিছুকাল পূর্বেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এখনও সর্পদংশিত লোকের চিকিৎসার জন্যে সকলের আগে ওব্বা গুনিন ডাকা হয়। বৈশাখের ১লা তারিখে বীজ বপন উপলক্ষে ভালো খাওয়া দাওয়ার আয়োজন সেদিনও হতো। আর্থিক অবনতির কারণে আজ এ-উৎসব লোপ পেতে বসেছে। কিন্তু ১লা বৈশাখ তারিখের মেলা এখনও হয়। আল্লাহ মেঘ দে পানি দে জাতীয় সমবেতভাবে অথবা একক ভাবে অবিরত উচ্চারিত যে কোনো মন্ত্রতন্ত্র-সৃষ্টির আদিতে ছিল কথা—in the beginning there was the word সুতরাং কথার ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী আদিম মানবসমাজ হতে আগত। ওলা বিবি শীতলা দেবীরা কিছুকাল পূর্বেও পল্লীবাংলার ত্রাস ছিলেন। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর আক্রমণ হতে গ্রাম রক্ষার জন্যে খন্দকার ও ঠাকুর নিয়োগ, মহামারী হতে গবাদি পশু রক্ষার জন্যে মন্ত্রজানা লোক নিয়োগ প্রভৃতি প্রথাও সম্ভবত বহু প্রাচীনকাল হতে বিদ্যমান। ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে পল্লী বাংলার জনসাধারণের মধ্যে এ-সব প্রথা এই সেদিন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এখনও কমবেশি আছে। অপরদিকে যে-কোনো সম্প্রদায়ের প্রাচীন মন্দির মসজিদের প্রতি পল্লী-বাংলার সাধারণ মানুষের ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ কিছুকাল পূর্বেও অত্যন্ত প্রবল ছিলঃ এখনও কমবেশি আছে। আমার নিজ বাড়ীতে আমার পিতামহ দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের উদ্দেশে করজোরে সম্মান প্রদর্শন—এমন কি বারান্দায় প্রণত হতে—স্বগ্রামের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের দেখেছি। এক প্রাচীন বিধবা ব্রাহ্মণী প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসতেন, মা'র সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলতেন। মা' প্রশ্ন করেছিলেন, মুসলমানের মসজিদের প্রতি প্রণতি জানাচ্ছেন কেন? তিনি সহজভাবে জবাব দিয়েছিলেন, ঈশ্বর সকল সম্প্রদায়ের, এটা ঈশ্বরের ঘর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বাংলার এই বিচিত্র লোক-সংস্কৃতিকে ধর্মীয় ফাণ্ডামেন্টালিজম এবং এসটাবলিসম্যান্টের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহরূপে গণ্য করে নিলেও কথা থেকে যায়। ভক্তি ও প্রেমবাদের প্রাধান্যাধীন সমন্বিত এ লোক-সংস্কৃতি তথা লোকধর্ম বাংলার পল্লীবাসী সাধারণ মানুষকে সমষ্টির শক্তির চেয়ে ব্যক্তির শক্তিকে উপরে স্থান দান—অর্থাৎ ব্যক্তিকে সকল আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক আপদ বিপদে ত্রাণকর্তারূপে গণ্য করতেও প্রবুদ্ধ করেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলার আর্থ রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে। ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ মজনু শাহ এবং ভবানী পাঠক নামক দু'জন ধর্মগুরুর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। জমিদার তালুকদার এবং নীলকরদের জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষকদের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব পীর নেসার আলী (তিতুমীর) এবং পীর দুদু মিঞা। আমাদের কালেও পীর মওলানা ভাসানী এবং পীর মওলানা শামসুল হুদা প্রমুখ শুধু কৃষক আন্দোলনের নয়, রাজনৈতিক আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দিয়েছেন। একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং সীমিত ক্ষেত্রে কমরেড মণি সিংহ ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা বাংলার কোনো ব্যাপক গণবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। পীর ও গুরুর প্রতি অবিচলিত গণ-আস্থা রাজনীতিকে নিছক ইহজাগতিক স্তরে নিয়ে আসার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। ফলে আমাদিগকে বারবার শুরু হতে শুরু করতে হচ্ছে। সুতরাং বৃটিশ-শাসন-পূর্ববর্তী সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের সমন্বিত লোক-সংস্কৃতি একদিকে যেমন সকল ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি, পাশাপাশি সহ-অবস্থান এবং অঘোষিত সহজ সমঝোতার মধ্যে যৌথভাবে জীবন যাপন প্রণালীর ফসল এবং এসটাবলিস-ম্যান্ট অর্থাৎ পুঁথিপুস্তকে লিপিবদ্ধ সুসংবদ্ধ কানুন বিরোধী একটি বৈপ্লবিক জীবনবোধ অপর দিকে তেমনি বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, নিয়তিবাদ, যৌন-সহজিয়াবাদ এবং নানা অন্ধ কুসংস্কার প্রভৃতিরও উৎসভূমি তার ভক্তি ও প্রেমবাদ। তা' সত্ত্বেও, আমার মনে হয়, বৃটিশ আগমন পূর্ববর্তী সাড়ে পাঁচশত বৎসর কাল-ব্যাপী সময়মধ্যে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠা বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির মূল আবেদন মানবিক। এর মধ্যে কোনো ধর্মমতের ফাণ্ডামেন্টালিজম খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

ইংরেজ আগমন পরবর্তী অবস্থা

ইংরেজ এ-দেশে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসার পর ক্রমে ক্রমে কলকাতা কেন্দ্রিক নগর সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকে। সেই সঙ্গে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং মুসলিম ব্রাহ্মণ্যবাদের (আশরাফ আতরাফ মোল্লাকি) অভ্যুত্থান শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। বৃটিশ রাজের জন্য দেশীয় সামাজিক ভিত আবশ্যক ছিল। এখানে স্মরণীয় যে, বর্তমানকালে সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদ বলতে যা বোঝায় মুসলিম শাসনামল তা ছিল না। আর্য, অনার্য রাজরাজড়াদের মতো মুসলমানরাও এ-দেশের স্থায়ী অধিবাসীরূপে রাজত্ব করেছেন। দেশের ধন বিদেশে চালান করেন নি, দেশেই ব্যয় করেছেন। ইংরেজ এ-দেশের ধন তার স্বদেশে স্থানান্তরিত করার বিশেষ উদ্দেশ্যে রাজত্ব স্থাপন করল। তার জন্য যে বিশেষ ধরনের সামাজিক ভিত রচনা আবশ্যক ছিল তার মধ্যে জনসংযোগ থাকাটা ছিল বিপজ্জনক। প্রথম ধাপে তৈরী করা হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রক্ষাকবচে শক্তিমান মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী জমিদার তালুকদার। দ্বিতীয় পন্থারূপে গ্রহণ করা হলো সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির নীতি। ইংরেজ শাসক ও বণিকদের সঙ্গে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণীর সহযোগিতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপক অসহযোগিতার কারণে সৃজনশীল অর্থনৈতিক বৈষম্য এ-নীতি সফল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিল। যেটা হতে পারত অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ সেটা সাম্প্রদায়িক বৈরিতায় পরিণত হলো।

এই শ্রেণীভেদ বা বৈরিতাকে আশ্রয় করে কলকাতাকেন্দ্রিক নগর সংস্কৃতিতে ক্রমে ক্রমে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবোধ জন্ম নিল। ইংরেজ তার মধ্যে নানা কৌশলে ইন্ধন যোগাতে থাকল। সুয়োরানী এবং দুয়োরানীর (প্রকৃতপক্ষে দাসী) ঝগড়ার মধ্যে বিদেশী স্বামী (ইংরেজ শাসক) হলো arbiter বা সালিশ। নগর সংস্কৃতি মানবিক সংস্কৃতি থাকল না, দু'টি বিবদমান যোদ্ধৃশিবিরে ভাগ হয়ে গেল। খাজা মইনুদ্দীন চিশতী ও তাঁর ভাবশিষ্যবৃন্দ, শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ভাব-শিষ্যবৃন্দ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সৈয়দ সুলতান, আব্দুল হাকিম, আলাওল প্রমুখ অগণিত খ্যাত অখ্যাত সুফী সাধু সন্ন্যাসী চারণ কবি কথক বাউল বৈরাগীর সুদীর্ঘ সাধনার ফলস্বরূপ বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে যে সমন্বিত লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল কোম্পানির আমলে রাজা রামমোহন রায় সজ্ঞানে সেই সংস্কৃতির মার্জিত রূপ শহুরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মোশাররফ হোসেন, আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ রামমোহনের উত্তরসূরী। সমাজের নীচের স্তরে গ্রাম বাংলায় সেই সমন্বিত লোকসংস্কৃতি সজীব ও সক্রিয় রাখার কার্যে মানবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন লালন শাহ, মদন বাউল, হাসন রাজা প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং অগণিত খ্যাত অখ্যাত গায়েন, বয়াতী, কথক, কবিয়াল, বাউল, বৈরাগী, ফকীর, দরবেশ, সাধু, সন্ন্যাসী এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে গোবিন্দ দাস, মুকুন্দ দাস, রমেশ শীল এবং আংশিকভাবে কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশকে বাংলার সমন্বিত লোকসংস্কৃতির মর্মবাণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

অপরদিকে শ্রেণী স্বার্থান্ধ উচ্চস্তরে নির্ভেজাল ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্যে সর্বপ্রথম সজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেন বাংলা সাহিত্যের অসামান্য প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য বিচারে বঙ্কিমের রচনাবলী অতুলনীয়। বাংলার কৃষক, কমলাকান্তের দপ্তরের মতো গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনৈতিক পৃথকতাবাদের জন্ম দিয়েছে। অপর দিকে চারণ কবিদের সহজ সরল ভাষাকে করেছে সমাস-সন্ধি কন্টকিত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ নিয়ন্ত্রিত। তার জবাব দানে নিযুক্ত হলেন তাঁর তুলনায় অনেক কম প্রতিভাবান কিছু কিছু মুসলিম কবি সাহিত্যিক। সৃজিত হলো অযথা ও অস্থানে প্রযুক্ত আরবি ফার্সী শব্দবহুল উনবিংশ শতাব্দীর ডানদিক হতে পৃষ্ঠা গণনার রীতিতে রচিত দোভাষী পুঁথি। বঙ্কিমী ভাষায় বঙ্কিমকে জবাব দানের কৌতুকপ্রদ ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং আরো কেউ কেউ। বঙ্কিম প্রতিভার কাছা-কাছি প্রতিভাসম্পন্ন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ রাজনৈতিক পৃথকতা-বাদ (Separatism) এবং মুসলিম ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান্দানী ঘরের যুবক ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণীর মুসলিম যুবককে উঁচু পদের সরকারী চাকরি না দেয়ার সুপারিশ করেন। তিনি ছিলেন বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে অভিন্ন মতাবলম্বী। উভয়েই কোম্পানির সরকার এবং ১৮৫৭ এর পরে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ভারত সরকারের উঁচু পদের কর্মচারী ছিলেন। বঙ্কিমকে রায় বাহাদুর এবং সৈয়দ আহমদকে স্যার উপাধি দিয়ে বৃটিশ সরকার তাদের খয়েরখাহির পুরস্কার দিয়েছিল। বাংলার নবাব সলিমুল্লাহ্‌কে স্যার সৈয়দ আহমদের অনুসারী বলা যায়। ফলে শত শত বর্ষব্যাপী সাধনা এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবিভাজ্যতার কারণে ক্রমে ক্রমে সৃজিত বাংলার যৌথ সমন্বিত এবং অসাম্প্রদায়িক লোকসংস্কৃতির মধ্যে শ্রেণী ও ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিগত নগর-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটল। ইংরেজের 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতি ষোলকলায় সফল হলো। উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা এই অনুপ্রবেশ সহজতর করল। সাক্ষরতা কিছুটা বৃদ্ধি পেল বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান ও মানবিক ধর্মবোধের অবনতি ঘটল। আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভাগ-বাটোয়ারার দ্বন্দ্ব ইয়োরোপে সৃষ্টি করল শ্রেণী চেতনা—Have এবং Have nots দের সংঘাত। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী প্রটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক সংঘাতের পরিণামে সৃষ্টি হলো ধর্ম-নিরপেক্ষ ইহজাগতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং পরবর্তী ধাপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতান্ত্রিক জনগণতন্ত্র। এ-দেশে অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং মজবুত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব হয়ে দাঁড়াল সমন্বিত লোকসংস্কৃতির মানবিক দিকটির উপর আঘাতের খড়্গ। তার পরিণামে বিভক্ত হলো দেশ।

তাই বলে ইসলাম এবং বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের শত শত বৎসর-ব্যাপী পাশাপাশি অবস্থান, সংমিশ্রণ ও পারস্পরিক আদান-প্রদানজাত বাংলার সমন্বিত লোকসংস্কৃতি তার শাশ্বত মানবিক আবেদন সম্পূর্ণরূপে হারায় নি। সে-আবেদন এবং এসটাবলিসমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ এখনও বাংলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান। এখনও পল্লী বাংলার পাটক্ষেতের মজুর সমবেতকণ্ঠে গায়, 'বেহানে উঠিয়া যাদুরে চাইল দুগ্ধ ননী আর ক্ষীর, যাচিয়া না পাই দুগ্ধ ননীরে ও আমার যাদু'। অথবা 'মাছে চিনে গহীন গম্ভীররে পইত্থে চিনে ডাল, মায় সে জানে পুত্রের বেদনরে যারই গর্ভের ছাল'। বলা বাহুল্য, ধমসম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলার সকল সাধারণ মানুষের যৌথ বিদ্রোহের ফল আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মিস্টার জিন্নাহর ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব যেমন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তেমনি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র মুঞ্জে কেলকার মালব্যের হিন্দু জাতিতত্ত্ব। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলার সমন্বিত লোকসংস্কৃতিরই অবদান। পদ্মা মেঘনা যমুনা বিধৌত চিরহরিতে সুশোভিত "আমার সোনার বাংলা" লোক সাহিত্যের ও বৃহত্তর অর্থে ফোকলোরের প্রাণ-কাঠামো নির্মাণ করেছে বলেই বাংলার লোকসংস্কৃতি বিজাতীয় এবং অমানবিক কোনো সংস্কৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করেনি—দ্বিজাতিতত্ত্বের মুখোশে বাংলার নিজ সত্তাকে বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্র সে বারবার প্রতিহত করেছে এবং আমার ধারণা ভবিষ্যতেও করবে।

সব সংস্কৃতিরই রূপান্তর ঘটে। শিক্ষার প্রসার, নতুন জ্ঞান, নতুন চেতনা, নতুন আর্থ-সামাজিক-অবস্থা, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নতুন প্রশাসনিক কাঠামো প্রভৃতি মিলে এই রূপান্তর ঘটায়। এ-যুগে নিভৃত পল্লীর লোকও কচ্ছপের পিঠে অথবা মহিষের শিংএর উপরে পৃথিবীর অবস্থানে বিশ্বাস করে না। আমাদের বাল্যকালে পল্লী সমাজে পালিত বহু আচার অনুষ্ঠান এখন বিলুপ্ত প্রায়। পল্লী সমাজেও রেডিও, টেলিভিশন প্রবেশ করেছে, নগর-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে লোকসংস্কৃতির মধ্যে। বহু কুসংস্কার হতে পল্লীর মানুষ মুক্ত হয়েছে। আবার নতুন কুসংস্কারও যে কিছু কিছু না ঢুকছে এমন নয়। দ্বন্দ্ব ও বিবর্তনের মধ্যেই মানব সমাজ এগিয়ে চলছে। লোকসংস্কৃতি যেহেতু সমাজ-মৃত্তিকা হতে উদ্ভূত, সেহেতু দ্বন্দ্ব ও বিবর্তন ক্রিয়ার মধ্যে সমাজের যে অগ্রাভিযান চলছে, তার সঙ্গেও লোকসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে—গতিশীল সমাজের চলমানতার সঙ্গে পা ফেলে সেও চলতে সক্ষম এবং এখানেই তার শক্তি তার ডিনামিজম। সমাজ তার দ্বৈত সত্তা—একদিকে সে অতীত স্মৃতির ধারক ও বাহক – বিগত অতীত লোকসংস্কৃতির অন্তরে কথা বলে, তার মর্মে মর্মে অতীত গুঞ্জরিত, অপরদিকে সে নতুনের বার্তাবহ, সে নতুনকে ধীরে ধীরে বরণ করে নেয়—নতুনের পথযাত্রায় সে এক বিরামহীন অনুষঙ্গী। পৌরাণিক লোককাহিনী, রূপকথা, পরীকাহিনী, কিংবদন্তী, প্রবাদ, লোকগীতি প্রভৃতির মধ্যে বিগত অতীতকে সে তার অন্তরের আধারে ধরে রেখেছে—ছড়ায় ও ধাঁধাঁয়ও অতীত বিধৃত। আবার আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই নতুন কিংবদন্তী নতুন রূপকথা, নতুন ছড়া, নতুন ধাঁধাঁ, প্রবাদ ও সংগীত তৈরী হচ্ছে। লোকসাহিত্যের-বৃহত্তর অর্থে ফোকলোরের-যা কিনা লোকসংস্কৃতির বিশাল ভূবনে বৃত, ডিনামিজম বলতে যা বোঝায় তার প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই নিহিত। গীতিময়তা মানব মনের বৈশিষ্ট্য। সংশয় ও অনুসন্ধিৎসা মানব মস্তিষ্কের স্বভাব। লোকসংস্কৃতিও তাই বিবর্তনশীল।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Dr. Tarachand. — Influence of Islam on Indian Culture.
2. Dr. Yusuf Hussain — Glimpses of Medieval Indian Culture.
3. Dr. Muhammed Enamul Haque — A Histsry of Sufism in Bengal.
4. Dr. Shafat Ahmed Khan [Edited by] — John Marshall in India [Notes on Observations on Bengal]
5. R. C Majumder & others — An Advanced History of India.
6. Ameer Ali — A Short History of Saracenes
7. do- — The Spirit of Islam
8. W. W. Hunter — Indian Musalmans.
9. Pre-partition Bengal Govt. Publication — Bengal Under the Lt. Governors.
10. Maxmuller — Six Systems of Indian Philosophy
11. Max Weber — Religon of India.
12. Russell — History of Western Philosophy.
13. J.M.Ghose — Sannyasi & Fakir Raiders of Bangal.
14. Govt. of India Publication — History of Eastern & Western Philosophy.
15. Myers — Ancient History.
16. Abu Jafar Shamsuddin — Sociology of Bengal Politics & Other Essays.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭. নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস
১৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙালী ও ইতিহাস
১৯. অতুল সুর — সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান
২০. আল বিরুনী — ভারততত্ত্ব
ডক্টর আবু মহাম্মেদ হাবিবুল্লাহ অনুবাদিত
২১. ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ — বাংলা সাহিত্যের কথা (১)
২২. অতীন্দ্র মজুমদার — চর্যাপদ
২৩. ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পাদিত) — ময়মনসিংহ গীতিকা
২৪. ডক্টর শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী — ইরান ও ইসলাম
(মুহাম্মদ মমতাজউদ্দীন অনুবাদিত)
২৫. ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত — সাহিত্যে প্রগতি
২৬. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক — মুসলিম বাংলা সাহিত্য
২৭. ডক্টর আহমদ শরীফ — বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য
২৮. সুধীর চন্দ্র সরকার — পৌরাণিক অভিধান
২৯. রামশরণ শর্মা — ভারতের সামন্ততন্ত্র
(চতুর্থ হতে দ্বাদশ শতাব্দী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজ বিজ্ঞান ও বাঙালী সমাজ

নিঃসন্দেহে, প্রাণীকূলে মানবসমাজ একটি গ্রুপ বা প্রজাতি। অন্যান্য প্রজাতির জীবনে জটিলতা অত্যন্ত কম। কুকুর একটি প্রজাতি, গরু একটি প্রজাতি, ইঁদুর একটি প্রজাতি। জৈব স্বভাবজাত কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার। তার বাইরে ওদের অন্য কোনোরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই বলেই মনে হয়। মানবজাতি পশুপক্ষীদের কোনো কোনো প্রজাতির কিছু অংশকে নানা কৌশলে বশীভূত করেছে। ওরা মানুষের কাজে লাগছে। ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগ রূপেও ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো কোনো প্রজাতির পশুপক্ষী। ইদানিং অবশ্য অনুন্নত দেশের মানুষকেও গিনিপিগ করা হচ্ছে। কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

মানবেতর প্রাণীর স্বভাবের একটি দিক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক প্রজাতির প্রাণীর সঙ্গে অন্য প্রজাতির ঝগড়া-ফ্যাসাদ-লড়াই, খাওয়া-খাওয়ি, খুনোখুনি আছে। কিন্তু অভিন্ন প্রজাতির মানবেতর প্রাণী পরস্পর বিবদমান নানা প্রকার স্বার্থবাদী শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। ওদের মধ্যে আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদাভেদ নেই। মৌমাছি ব্যতীত অন্য কোন প্রজাতির মধ্যে সম্ভবত মালিক-শ্রমিক সম্পর্কও নেই। একই প্রজাতির পশুপক্ষীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি ও মারামারি হয়, কিন্তু সেটা হয় ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে। একই প্রজাতির মানবেতর প্রাণী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না।

মানবজাতি তার ব্যতিক্রম। ঐতিহাসিককালের শুরু থেকেই মানবজাতি রাজাপ্রজা, শাসক-শাসিত শোষক-শোষিত, আশরাফ-আতরাফ, শ্রমিক-মালিক, পুরোহিত-অ-পুরোহিত (Laity), প্রভু-ভৃত্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তা ছাড়াও রয়েছে পরস্পর বিবদমান নানা ধর্ম-বিশ্বাসী সম্প্রদায়। আছে নানা ভাষা-ভাষী লোক। আছে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী নানা জাতি-উপজাতি প্রভৃতি। প্রতিটি গ্রুপের ইহজাগতিক স্বার্থ আলাদা। বর্ণবিদ্বেষও আছে। এক কথায় ঐতিহাসিককাল হতেই মানবজাতি নানা পরস্পর বিরোধী স্বার্থবাদী শিবিরে বিভক্ত। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যেই হোক অথবা বিরোধ অধিকতর তীব্র করার জন্যেই হোক বিরোধী শিবিরগুলো কখনও একে অপরের বিরুদ্ধে, কখনও বা এক যুক্তফ্রন্ট অন্য যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে বহুকাল হতে সশস্ত্র যুদ্ধ করে আসছে। মানুষের হাতে নিহত হয়েছে অগণিত মানুষ—শস্য শ্যামল জনপদ হয়েছে ভস্মীভূত। বিরোধ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে রাজ্য, সাম্রাজ্য, উদ্ভব হয়েছে সামন্তশ্রেণীর, স্থাপিত হয়েছে জাতিক-রাষ্ট্র; যুদ্ধ হয়েছে জাতিতে জাতিতে; দেশপ্রেম, ধর্মপ্রেম, প্রভৃতি বোধের (Concept) জন্ম হয়েছে। বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে রাজরাজড়া ও রাজত্বের উত্থান-পতন হয়েছে। বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ভাষা ও ভাষাভাষী গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়েছে। নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুরাতনের স্থান অধিকার করেছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পদ্ধতির।

মানবজাতির এ ইতিহাসকে অনেকে দেখেছেন পরস্পর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে। হারবার্ট এ. এল. ফিশার বলেন, "I can see only one emergency following upon another as wave follows upon wave. Only one great fact with respect of which, since it is unique, there can be no generalisations, only one safe rule for historian : that he should recognise in the development of human destinies the play of contingent and unforeseen".[১]

সমালোচকদের মতে বিখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবিও একই পথের পথিক। "One of Toynbee's initial propositions is denial of the unity of the historical process. In his own inimitable form he develops the idea of Spengler, who in the spirit of medieval nominalism, denying the objective existence of general concepts, maintained that 'mankind is an empty word' and that only individual ethnico-cultural communities actually exist. According to Toynbee, history is the history of different isolated civilisations, which arose, developed and disappeared without making any appreciable impact on one another. But what force conditions the movement of civilisation, its rise and development ? Such a force is the intellectual elite, the thinking and creative minority, leading the 'inert majority' which lacks the reason and will to engage in independent historical creativity".[২]

পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকগণ ভুলে যান যে, সকল কালের তথাকথিত 'intellectual elite' শ্রেণী সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যেরই সৃজন। একালের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, intellectual elite তৈরীর জন্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। সাধারণ মানুষের ছেলে মেয়েদের পক্ষে এসব ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ সম্ভব নয়। সুতরাং intellectual

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

elite আকাশ থেকে পতিত কোনো বিশেষ ধরনের প্রাণী নয়, বৃহত্তর মানব সমাজেরই অংশ। ওরা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক-শাসক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

মানবেতিহাসের যুগ পরিবর্তনকারী কোনো ঘটনাই অপ্রত্যাশিত কিংবা আকস্মিক কিছু নয়। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যেই আপাতঃদৃষ্টে অপ্রত্যাশিত ঘটনার বীজ উপ্ত থাকে। গ্যাস জমলে বিস্ফোরণ ঘটবেই। রোমান সাম্রাজ্যের দাস বিদ্রোহ, পরবর্তীতে ইয়োরোপের নানা বিদ্রোহ, যুদ্ধ বিগ্রহ, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতি কোনো ঘটনাকেই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। দীর্ঘ-সময় ধরে সমাজে এসবের কারণ পুঞ্জীভূত হয়। যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন 'status quo' এর অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসীদের কাছে মনে হয়, এমনটি হওয়ার তো কথা ছিল না।

অন্য মতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা মানবেতিহাসকে কতকগুলো পরস্পর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর সংকলন মনে করেন না। তারা ইতিহাসকে দেখছেন সমগ্র মানবজাতির পরিক্রমারূপে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, স্থানে স্থানে অসম বিকাশ, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিক্রমার গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন চরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও শেষোক্ত মতের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মানবজাতির ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এবং সমাজে স্তরভেদের কার্যকারণ খুজতে গিয়ে মানবেতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন কার্ল মার্কস। আমরা জানি তার ব্যাখ্যার নাম Economic Interpretation of History. তাঁর এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী "each system of production relations is a specific social organism, whose inception, functioning, and transition to a higher form, conversion into another social organism, are governed by specific laws".[৩]

এক শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা পৃথিবীর সর্বমহলের আলোচ্য বিষয়। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ সোভিয়েত রাশিয়াসহ ভূমণ্ডলের আরো বহু দেশে মার্কসীয় ব্যাখ্যা গৃহীত হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতি। বিশ্ব এখন প্রকৃত পক্ষে দু'টি শিবিরে বিভক্ত। তৃতীয় কোনো পদ্ধতি আজকের পৃথিবীর কোথাও বিদ্যমান নেই। থাকা সম্ভবও নয়। লক্ষ্যাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় ধরনের সমাজ পদ্ধতির মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক বিদ্যমান।

এখানে একটি চির নতুন চির পুরাতন বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে। বৈষয়িক অবস্থা (objective condition) আমরা সাদা চোখেই দেখতে পাই। আঁস্তাকুড় এবং গোলাপ বাগান পাশাপাশি আছে। একই শহরের একাংশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘিঞ্জি নোংরা বস্তি (slum) অন্য অংশে প্রাসাদোপম অট্টালিকা সজ্জিত অভিজাত এলাকা। যদি কেউ দেখতে না পায় তাহলে বুঝতে হবে যে, হয় সে অন্ধ অথবা নির্বোধ। কিন্তু ব্যৈক্তিক অথবা সামাজিক ধ্যান-ধারণা (concept) ভাবাত্মক ব্যাপার। সুনীতি-দুর্নীতিবোধ, লক্ষ্যাদর্শবোধ প্রভৃতিও ভাবাত্মক। এগুলোর কোনোটাই চরম ও পরম সত্য নয়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রথা-পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব ধ্যান-ধারণাও পরিবর্তিত হয়। এক সময়ে দাস প্রথাকে স্বাভাবিক মনে করা হতো। আমার বাল্যকালেই জমিদারের খাজনা না দেয়াকে মনে করা হতো অন্যায় কাজ। জমিদারকে মনে করা হতো ভূমির ঈশ্বর-নির্দেশিত মালিক। খাজনা শোধ না করলে ফসল হয় না, এ ধারণা ছিল ব্যাপক। আজ দাস প্রথাও নেও, জমিদারও নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওসব প্রথা সম্পর্কিত উপরিউক্ত ধ্যান-ধারণাও নেই।

ভাব মানেই ভাবুকের সামাজিক অবস্থান, পরিবেশ এবং প্রতিবেশগত প্রতিক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নয়। জন্মকালে মানবশিশু ভাষাহীন নির্বোধ। পরিবার ও সমাজে লালিত পালিত হওয়ার কালে সে তার সমাজে প্রচলিত ভাষা শিখে। ভাষা পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সামাজিক মাধ্যম। ভাষা এবং সততঃদর্শিত সামাজিক আচরণ শিশুকে করণীয় অকরণীয় কাজকর্ম বিষয়ে বোধ-শক্তি প্রদান করে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই যদি মানবশিশু সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং মানবশূন্য স্থানে এসে বড় হয় তা'হলে সে জন্মকালে যেমন নির্বোধ ছিল তেমন নির্বোধই থেকে যায়। জৈবধর্ম পালন ব্যতীত তার জন্য অন্য কোনো কাজ থাকে না। অন্য কোনো চিন্তাও করতে পারে না। আগেই বলেছি জৈব ধর্ম পালন প্রাণী মাত্রেরই স্বয়ং চালিত (automatic) কর্ম। যে কোনো প্রকারের ভাবাত্মক (subjective) চিন্তার কোনো না কোনো লক্ষ্য থাকে। ভালো করার লক্ষ্য না থাকলে 'ভালো' নামক বোধটির জন্ম হতো না। 'ভালো' বোধটির সমকালীন সামাজিক সংজ্ঞা আছে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী যা ভালো সে চিন্তাই করে মানুষ এবং করেও তেমন কাজ। ভাষার মাধ্যমে যা বলা হয়, তার অর্থ বক্তা নিজেও বোঝেন, শ্রোতারাও বোঝেন। সুতরাং সচেতন মানুষ মাত্রেরই ভালোমন্দ লক্ষ্যাদর্শ থাকে। কারো সোচ্চার, কারো অনুচ্চারিত। পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা নামে কোনো বস্তু নেই। দু'ধরনের মানুষ "নিরপেক্ষ" হতে পারে। এক নির্বোধ. আমরা যাদের "মগা" বলি তারা। দুই, প্রচলিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে যারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন তারা। অন্য সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষপাত আছে। স্বৈরাচারী শাসক-শোষক শ্রেণী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষপাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বৈরাচারী পদ্ধতির প্রতি। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণকামীর পক্ষপাত সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যাদর্শের প্রতি।

এককালে ইয়োরোপে আর্ট ফর আর্টস সেক (Art for Arts Sake) অর্থাৎ শিল্পের জন্যেই শিল্প মতবাদ প্রবল ছিল। এখন খুব কম শিল্পীই এ মত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে শিল্পের লক্ষ্যাদর্শ থাকতে হবে। তেমনি বিদ্যার জন্যেই বিদ্যা অর্জনের মতবাদও অচল। জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না। পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশে এ উক্তির ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। কাজে লাগার অর্থ জ্ঞানার্জন-প্রবৃত্তির পশ্চাতে লক্ষ্যাদর্শ আছে। সমাজ-বিজ্ঞান জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাখা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মতো সমাজবিজ্ঞানের চর্চাও ঐতিহাসিককাল হতেই কোনো না কোনো নামে চলে আসছে। কারো কারো মতে, সমাজবিজ্ঞানের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে। কথাটি আংশিকভাবে সত্য! অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে একটি আলাদা শৃংখলারূপে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। কিন্তু আমরা যখন এ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক রচনাবলী পাঠ করি, পাঠ করি প্লেটোর 'রিপাবলিক' তখন কি প্রকৃতপক্ষে সমাজবিজ্ঞানই পাঠ করি না? প্লেটোর 'রিপাবলিক' এবং এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকসের' মধ্যে শুধু সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়নি, গ্রন্থকারদের লক্ষ্যাদর্শও ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর মনীষী ইবনে খালদুন তার বিশ্ব ইতিহাসের ভূমিকা "আল মুকাদ্দিমায়" এ কথা বলেছেন যে, চিন্তা শক্তির আকর্ষণে মানুষ যখন পরস্পর-এর সহায়তায় এগিয়ে গেছে এবং সম্মিলিত প্রয়াসে পৃথিবীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে তখনই "উমরান" অর্থাৎ সভ্যতার জন্ম হয়েছে। "উমরান" শব্দটি 'জবরদস্তি' অর্থেও তিনি ব্যবহার করেছেন। শব্দটির ধাতুগত অর্থ নির্মাণ করা ঃ আবাদ করা। এই সঙ্গে ইবনে খালদুন ব্যবহৃত অন্য একটি term "ইজতেমাউল বশরী" (মানব-সমাজ) মিলিয়ে বিচার করলে তার মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা মানব সমাজেরই বিনির্মিত কীর্তি। সত্য বটে, মানব সমাজের সর্বত্র যুগপৎ এবং সমানভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তৃতিলাভ করেনি। এই অসমতার কারণ হিসেবে প্রতিবেশ-পরিবেশগত বৈচিত্র্যের প্রভাব ছাড়াও সমাজ জীবনের একটি আভ্যন্তরীণ কারণের উল্লেখ এবং তা অত্যন্ত বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন ইবনে খালদুন। এই কারণটির নাম দিয়েছেন তিনি "আসাবিয়া" বা "গোত্রপ্রীতি"। তার মতে "আসাবিয়ার" শক্তি যে পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় হয়েছে সভ্যতা বিনির্মাণে তার প্রভাবও হয়েছে তত বেশি স্থায়ী এবং দর্শনীয়। বস্তুতঃ, গোত্র-প্রীতি থেকেই মানবজাতির গোত্রবদ্ধ জীবনের বিকাশ। এটি সমাজ বিকাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাথমিক স্তর। ইবনে খালদুন এটাকে "বদোয়া" বা যাযাবরী জীবন নাম দিয়েছেন। এই যাযাবর গোত্র-শক্তিই আরো সংঘবদ্ধ হয়ে নগর নির্মাণ করেছে এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে নগর-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এমন কি রাজ্যস্থাপন, বিস্তার এবং তার স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব-এর মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় ইবনে খালদুন তার মধ্যেও "আসাবিয়ার" অমোঘক্রিয়া দেখেছেন। ফলতঃ সমাজ বিকাশের সর্বত্র তিনি আসাবিয়ার শক্তির প্রবল প্রতাপ লক্ষ্য করেছেন[৪]। বলা বাহুল্য এগুলো যুগপৎ সমাজবিজ্ঞান এবং "ইতিহাসের দর্শনের" কথা। আধুনিক জাতি ও জাতিক রূপের উদ্ভবমূলে ইবনে খালদুনের "আসাবিয়া" তত্ত্ব কতটা ক্রিয়া করেছে তা পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিচার্য বিষয়। ইতিহাস বলে, স্থায়ী বসতি স্থাপনের পূর্বে মানুষ যূথবদ্ধ হয়ে বিচরণ করত। কিন্তু গোত্র প্রীতির উপর গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও ইবনে খালদুন মানবজাতিকে একটি অবিচ্ছেদ্য সমাজরূপে চিন্তা করেছেন। স্মরণীয় যে, চাণক্য এবং মেকিয়াভেলির মধ্যে রাজার রাজ্য শাসন বিষয়ে চিন্তা আছে। গ্রীক মনীষীদের রাষ্ট্র-চিন্তা ওদের রচনায় নেই। কিন্তু ওরাও মানব-সমাজকে শ্রেণী বিভক্ত করে দেখেছেন। বলা বাহুল্য, শ্রেণী বিভাগ এবং বিচ্ছিন্নতা এক বস্তু নয়।

একালে সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে আমি যখন ভাবি তখন কোনো কূল কিনারা পাই না। সাগর মন্থন করার কথা বলা হয় বটে। কিন্তু সাগর কি সত্য সত্যই মন্থন করা যায়? পোপ বলেছেন, "The proper study of mankind is man"। নামই প্রমাণ করে যে, মানব সমাজটাই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ফিজিওলজি, বায়োলজি, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভাষা প্রভৃতি বহু বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু সব কিছুরই জনক যেমন মানব সমাজ তেমনি সব কিছুই শিক্ষা দেয়া হয় মানব জাতিকে এবং মানব জাতির জন্যই। তুলনীয় "Government of the people, by the people, for the people" বাক্যটি।

সুতরাং আমার মতে, সমাজবিজ্ঞানে বিদ্যার সকল শাখা-প্রশাখা এসে মিলিত হয়েছে, শত নদী শত দিক থেকে এসে যেমন সাগরে মিশে যায় তেমনি।

একালে প্রধানতঃ রাজনৈতিক প্রয়োজনে (রাজনীতিও সমাজবিজ্ঞানেরই অংশ) সমাজবিজ্ঞানকে প্রথমতঃ একটি আলাদা ডিসিপ্লিনরূপে এবং দ্বিতীয়তঃ সেটাকে আবার শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করে অধ্যয়ন করা হচ্ছে। আগেই বলেছি, পৃথিবীতে এখন মাত্র দু'টি আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি বিদ্যমান। দুই পদ্ধতির সমর্থকগণ দু'টি শিবিরে বিভক্ত। ওদের রাজনৈতিক প্রয়োজন বা লক্ষ্যাদর্শও আলাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঁজিবাদী পদ্ধতির প্রতি অনুগত সমাজবিজ্ঞানীদের কারো কারো কথা শুনলে মনে হয়, ওরা বুঝিবা প্রগতির কথা বলছেন। বুঝিবা চাচ্ছেন মানবজাতির কল্যাণ। আসলে বাক্য-জালের কৌশলে ওরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চান। প্রকৃতপক্ষে ওরা status quo-এর সমর্থক। সমাজবিজ্ঞানের সহায়তায় ওরা পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি বহাল রাখতে চান। এরা রুশ বিজ্ঞানী পাভলভের conditioned reflex তত্ত্বটি প্রয়োগ করছেন মানবজাতির উপর। বিখ্যাত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী পি. সরোকিন তার একটি দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন চলছে সরোকিন লিখলেন, We are living and acting at one of the epoch-making turning points of human history, when one fundamental form of culture and society-sensate is declining and different form is emerging.... This means that the main issue of our times is not democracy versus totalitarianism, nor liberty versus despotism, neither is it capitalism versus communism nor pacifism versus militarism nor internationalism versus nationalism nor any of the current popular issues daily proclaimed by statesmen and politicians ; professors and ministers ; journalists and soapbox orators. All these popular issues are by-products of the main issue, namely the sensate form of culture and way of life versus another different form. Still more insignificant are such issues as Hitler versus Churchill or England versus Germany or Japan versus United States.....It was not the Hitlers, Stalins and Mussolinis who created the present crises ; the already existing crisis made them what they are—its instrumentation and puppets".[৫]

সরোকিন অবশ্য বলছেন, "The complete disintegration of our culture and society (বলা বাহুল্য পশ্চিমী) claimed by the pessimists, is impossible, also for the reason that total sum of social and cultural phenomena of western society and culture has never been integrated into one unified system. What has not been integrated, can not, it is evident, disintegrate".[৬]

কথাগুলো শুনতে চমৎকার কিন্তু আসলে তার মতলবটা কি? তিনি ideational, idealist এবং sensate এই তিন প্রকার সংস্কৃতির শনিচক্রের (vicious circle) মধ্যে মানবজাতি সততঃ পরিক্রমণশীল সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং sensate সংস্কৃতির মধ্যে যেগুলো integrate করেনি সেগুলি হচ্ছে ideational এবং idealist সংস্কৃতি ও সভ্যতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৯৫৭ সালে সরোকিন কি চান তা স্পষ্ট করে বলেছেন, "This struggle between the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

forces of the previously creative but now largely outworn sensate order and the emerging, creative forces of a new-ideational or idealistic order is proceeding relentlessly in all fields of social and cultural life. The final outcome of this epochal struggle will largely depend upon whether mankind can avoid a new World War".[৭]

সরোকিন-এর ideational এবং idealistic যুগ প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন এবং মধ্যযুগ। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বর্তমান sensate যুগের অবসানে তিনি উক্ত দু'যুগের যে কোন একটির পুনঃ প্রতিষ্ঠার মধ্যে মানব সমাজের মুক্তি দেখতে পাচ্ছেন। তিনি পুঁজিবাদী প্রথা এবং সমাজতান্ত্রিক প্রথাকে এক পাল্লায় তুলেছেন। শিল্প-বিপ্লবোত্তর টেকনোলজির সঙ্গে পুঁজিবাদী প্রথায় উৎপাদন রীতির অসংগতিপূর্ণ সহ-অবস্থানজনিত বিরোধ হতেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দু'টি পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে জানের চেয়ে মালের মূল্য অধিক। পুঁজিবাদ সকল প্রকার বিষয় সম্পত্তি এবং উৎপাদন উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানায় দৃঢ় বিশ্বাসী। পুঁজিবাদ সজ্ঞানে মানব সমাজকে শ্রেণীবিভক্ত করে ঃ বর্ণ বৈষম্যও পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। পুঁজিবাদ জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে কলম ধরে। হেগেলের মতো অসাধারণ প্রতিভাও, "The German spirit is the spirit of the new world" বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি[৮]।

পক্ষান্তরে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যাদর্শ শ্রেণীহীন মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্র মালের চেয়ে জানকে অধিক মূল্যবান মনে করে। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" সমাজতন্ত্র এ মতে দৃঢ় বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্র পৃথিবীর সকল সম্পদ এবং উৎপাদন উপকরণের উপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানব সমাজের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠায় আস্থাবান। আমাদের কোরান শরীফ বলে, পৃথিবীতে মানবজাতি আল্লাহতালার খলিফা (প্রতিনিধি) (ইন্নীজায়েলুন ফীল আরদে খলিফাতুন), বিশেষ কোনো শ্রেণী, বর্ণ, জাতি বা ধর্মাবলম্বী নয়। আমরা যদি এই মূল সূত্রটি মনে রাখি তাহলে প্রুধোর 'property is theft' মতের সারবত্তা উপলব্ধি করার অসুবিধা হয় না। সমাজতন্ত্র idealist, ideational, sensate চক্রবৃত্তের বাইরের ব্যাপার। সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে নতুন ধরনের সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আইন-কানুন, নীতিমালা প্রভৃতি নির্মাণ করে চলছে।

সুতরাং crisis of our age আমাদের কালের সংকট দু'দিক থেকে বিচার্য। পুঁজিবাদী পদ্ধতির অভ্যন্তরীণ সংকট তার একদিক। এই পদ্ধতিতে শাসিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ছাড়াও রয়েছে প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক বিরোধ। শ্রেণীতে শ্রেণীতে পর্বত প্রমাণ বৈষম্য বজায় রেখে এ বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কালের সংকটের অপর দিক হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ এই দুই বিপরীত ধর্মী পদ্ধতির অনতিক্রমন্য ব্যবধান বা বিরোধ। হিটলার-মুসোলিনি-চার্চিল প্রমুখ ছিলেন পুঁজিবাদী পদ্ধতির প্রতিনিধি। ওদের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন না কেউ। চার্চিল তো সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, " I am not going to preside over the liquidation of Her Majesty' s British empire".

অপর দিকে, স্টালিন ছিলেন সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতিনিধি। এখন চার্চিল গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রেসিডেন্ট রিগান, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থেচার প্রমুখ। সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন গরবাচভ, ফিডেল ক্যাস্ট্রো প্রমুখ। আমরা যদি Evolution অর্থাৎ বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করি তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির স্থলে পুঁজিবাদী পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা যেমন ছিল মানব সমাজের একটি যুগ পরিবর্তকারী পদক্ষেপ, তেমনি আজকের দিনে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিও একটি যুগ পরিবর্তনকারী অগ্রযাত্রা। পুঁজিবাদী পদ্ধতি পৃথিবীর উপর দু'আড়াইশ বছর বহাল রয়েছে। আর কত ? আপন ঐতিহাসিক ভূমিকা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্প্রসারিত হতে থাকবেই।

পুঁজিবাদী পদ্ধতির মুখপাত্রগণ, তার মধ্যে সমাজবিজ্ঞানীও আছেন, জোড়া-তালি দিয়ে পদ্ধতিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছেন। এ জন্যে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করছেন। তারা সমাজবিজ্ঞানকে বৃহত্তর মানবসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন করে নানা ভাগে বিভক্ত করেছেন। এখন কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের অভিজাত ও এলিট শ্রেণীর সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক, জনমত, ব্যৈক্তিক ও সামাজিক সাইকোলজি, জনতার সাইকোলজি, যুদ্ধ ও শান্তি প্রভৃতি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের জন্যে আলাদা বিশেষজ্ঞ আছেন। নতুন নতুন বিভাগ উপ-বিভাগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিভাগীয় বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিঃসন্দেহে মানবজাতির জ্ঞান বৃদ্ধি করছে। সমাজের নানা-দিক নানা গ্রুপের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তথ্য জমা হচ্ছে। এগুলোর মূল্য আছে। কিন্তু পুঁজিবাদী পদ্ধতির সুযোগ-সুবিধা-ভোগী সমাজবিজ্ঞানীদের এসব মূল্যবান অনুসন্ধিৎসার মূল উৎপ্রেরণা আসছে status quo-স্থিতাবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতি বহাল রাখার সংগোপন ইচ্ছা থেকে। তাই আমি এটাকে জোড়াতালি দেয়ার কাজ বলেছি। কিন্তু রিফু করে অথবা তালি দিয়ে পরিধেয় বস্ত্র খুব বেশি দিন ব্যবহার করা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, স্থান ও অঞ্চল বিশেষের অগ্রসরতা অনগ্রসরতা, বৈশিষ্ট্য, ভাষার বিভিন্নতা প্রভৃতি সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে মানবজাতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে এবং তারা উত্তরোত্তর উন্নত হতে উন্নততর জীবন-যাপন প্রণালী আবিষ্কার ও কায়েম করে চলছে। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানী কি কাজ করছেন সেটা আমাদের কাছে বড় কথা নয়। তার কাজের লক্ষ্যাদর্শ কি সেটাই আমাদের কাছে বড় কথা।

২

এখন তত্ত্বীয় আলোচনা ছেড়ে আমাদের দেশের বাস্তব জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ইদানীংকালে উন্নতমানের গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক রামশরণ শর্মার ভারতীয় সামন্ততন্ত্র (প্রাক-মুসলিম আমল) এবং অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭) নামক গ্রন্থদ্বয়। এ ছাড়াও আরো বহু গ্রন্থ আছে। সেসব গ্রন্থ দেখার বা পাঠ করার সুযোগ হয়নি।

যে যুগে পশ্চিম ইয়োরোপের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করল, বের হলো দিগ্বিজয়ে তখন ভারত পিছিয়ে থাকল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন ইদানীংকালের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। অনেকে স্বয়ম্ভর গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। অনেকে চতুর্বর্ণাশ্রয়ী ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষানুক্রমিকভাবে পেশা নির্দিষ্ট এবং পণ্য বিনিময় প্রথা বহাল থাকার ফলে শ্রমিকের অনুসন্ধিৎসার অভাবের বিষয় উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, পশ্চিম ভারতে প্রাচীনকাল হতেই ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার ফলে চাষীর সর্বনিম্ন প্রয়োজন পূরণ হতো। অনেকে এটাকেও অনগ্রসরতার কারণ বলেছেন। ভারতে সামন্ততন্ত্র থাকলেও উচ্চবর্ণীয় সামন্তরা তাদের অধিকৃত ভূমি নিজস্ব 'খামার' হিসেবে ইয়োরোপীয় সামন্তদের মতো চাষবাস করতো না। চাষী মোটামুটি পুরুষানুক্রমিকভাবে জমি চাষ করতো, বেশি উৎপীড়িত হলে বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে পালিয়ে যেতো, অবস্থা অনুকূল হলে আবার ফিরে আসতো, এ সব কারণও উল্লেখ করেছেন অনেকে। ইরফান হাবিব কতগুলো কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ করে বলেছেন এগুলো সুনির্দিষ্ট দাবীদাওয়া ভিত্তিক বিদ্রোহ ছিল না ঃ ছিল বিশেষ কোন একজন সামন্ত অথবা রাজ-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা সামন্তদের পারস্পরিক বিরোধে কোনো একজনের পক্ষ সমর্থন; একালেও যেমন বাংলা-দেশে চর দখলের জন্যে নিম্ন শ্রেণী হতেই উভয় পক্ষের লাঠিয়াল সংগৃহীত হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন ব্যাপার। অর্থাৎ কাজটা ছিল নেতিবাচক। বিদ্রোহীদের সর্দারই হয়তো নতুন জালেমরূপে দেখা দিত অথবা বিদ্রোহীরা লুটেরা গ্যাং রূপে দেশে লুঠতরাজ করে বেড়াতো। স্মরণীয় যে, শিবাজীর মৃত্যু এবং আহমদ শাহ আবদালির সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর মারাঠারা বর্গী দস্যু বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়।

শক, হুন, গ্রীক আক্রমণকারীরা ভারতীয় সমাজ-জীবনে গৃহীত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একেশ্বরবাদী ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিয়ে আগত মুসলিম আক্রমণকারীরা ভারতে রাজ্য স্থাপনের পর উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু সমাজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে কচ্ছপের মতো আপন মস্তিষ্ক গুটিয়ে নিল। ওরা মুসলিম রাজা-বাদশাহদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করল, ফার্সিও শিখল, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করেই চলল। এটাকেও অনেকে ভারতের পশ্চাদপদতার একটি কারণরূপে চিহ্নিত করেন। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের অন্য একটি বৈশিষ্ট্যও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। মুসলিম আগমন-পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছাড়াও জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটে, এবং বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। কিন্তু কালক্রমে ভারতের মাটি হতে উদ্ভূত উক্ত দুটো ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটা সমঝোতা হয়ে যায়। শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর নিরাকার নির্গুণ নির্বিকার। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর অনুপস্থিত। নিরাকার নির্গুণ নির্বিকার ঈশ্বর থাকা না থাকার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শংকরাচার্যের পরে একমাত্র পূর্ববাংলা ব্যতীত ভারতের অন্য কোথাও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থাকল না। অপরদিকে, শুধু এক ধর্ম নয় রাষ্ট্রীয় কার্যেও ভারতের সর্বত্র সংস্কৃত ভাষা বহাল হয়। তা সত্ত্বেও, ভারতে জাতিক ঐক্যচেতনা এমন কি ধর্মীয় ঐক্যবোধও জন্মালো না। যে কোন একটি ঐক্যচেতনা বিদ্যমান থাকলেও ভারতে মুসলিম রাজত্ব স্থাপন অসম্ভব হতো। অপর দিকে, ইংরেজরা যখন এদেশ অধিকার করে তখনও ভারতে হিন্দুর সংখ্যা বেশি। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখরাও তখন শক্তিশালী। ঐ সময়ে পুনরায় হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হতে পারতো না। এমন কি, মুসলিম সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করলেও ইংরেজ আসতে পারতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু কি আশ্চর্য, ও রকম কিছুই ঘটল না। শিখ শক্তিও হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো জ্বলে উঠে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরেই নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। প্রতিরোধ না করে বরং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায় নানা স্বার্থান্বেষী গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেল। ইংরেজদের ডেকে এনে মসনদে বসাবার লোকের অভাব হলো না ভারতে। ফৌজী বিদ্রোহের সময়ও বিভেদ থেকেই গেল। পৃথিবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল। বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ফৌজী বিপ্লবকে বিদ্রূপ করে কাব্য রচনা করল।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে সার্বিক জলসেচ ব্যবস্থা ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং এখানে কৃষক শ্রেণীর নিষ্ক্রিয়তার কারণ রূপে সেচ-ব্যবস্থাকে উপস্থিত করা অযৌক্তিক। অপরদিকে, এ অঞ্চলের দু'টি ঘটনাকে ব্যতিক্রম-ধর্মী বলা যায়। মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ অরাজক ব্যবস্থা অবসানের লক্ষ্যে এতদঞ্চলের প্রকৃতি অর্থাৎ তৎকালীন মাতব্বরগণ একত্র হয়ে গোপাল নামক একজন মাতব্বরকে রাজ-চক্রবর্তীর সিংহাসন দান করে। নিঃসন্দেহে, এটি ছিল একটি ইতিবাচক গঠনমূলক কাজ। দ্বিতীয় ঘটনা, পাল আমলের কৈবর্ত সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্রাটের সেনাবাহিনীকে পরাভূত এবং অস্থায়ী হলেও, স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এটিও একটি ইতিবাচক কাজ ছিল। তাছাড়াও, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। প্রথমতঃ গোটা অঞ্চলে একটি ভাষার প্রচলন ছিলো। দ্বিতীয়তঃ শতকরা ৯০/৯৫ জন মুসলমান ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং আদিবাসী সম্প্রদায় হতে ধর্মান্তরিত। তৃতীয়তঃ এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছে সুফী দরবেশ শ্রেণীর প্রচারকদের দ্বারা। সুফী দরবেশদের সঙ্গে হিন্দু সর্বেশ্বরবাদ (pantheism)-এর যথেষ্ট মিল আছে। মনসুরের আনাল হক (আমিই সত্য) ঘোষণার সঙ্গে হিন্দুর "তুমিই সেই" (শ্বেতকেতুকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল) তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট বলে মনে হয়। সুফীবাদের কয়েকটি তরিকা (আধ্যাত্মিক পথ) আছে। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে সর্বেশ্বরবাদী স্কুলের প্রাধান্য বিদ্যমান। এ শাখার সুফীবাদী ইসলামে আনুষ্ঠানিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় না। বিষয়টির উপর অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৯] এখানে উল্লেখ করার কারণ, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তিমূলক একেশ্বরবাদী সংস্কার আন্দোলন কতটা ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত সে বিষয়ের আলোচনায় না গিয়েও একথা বলা চলে যে, সুফীবাদ এবং শ্রীচৈতন্যের ধর্মের সমন্বয়ে বাংলাদেশে একটি সমন্বিত লোক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই সমন্বিত লোক সংস্কৃতি যুগপৎ উভয় ধর্মের মৌলবাদ এবং এ্যাসটাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। এটাও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর নীল-বিদ্রোহও হয় বাংলাদেশেই। প্রথমটি ছিল কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ। ঐ বিদ্রোহের সঙ্গে বাংলার চাষী শ্রেণী সহযোগিতা করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লর্ড রিপন ১৮১০ খৃস্টাব্দে ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "They had established a terrorism as perfect as that which was the foundation of the French Republican power and in truth the Sardars or captains of the band were esteemed or even called the Hakeem or the ruling power, while the Government did not possess either authority or influence enough to obtain from the people the smallest aid towards their own protection. If a whole village was destroyed not a man was found to complain."[১০]

নীল-বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাংলাদেশের তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার জে, পি. গ্রান্ট স্টীমারযোগে সিরাজগঞ্জ সফর করে এসে লেখেন, "On my return a few days afterwards along the same two rivers from dawn to dusk as I steamed along the two rivers for some 60 or so miles, both banks were literally lined with crowds or villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves.....It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women and children has no deep meaning. The organisation and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects, worthy of much consideration."[১১]

এ বিদ্রোহ সম্বন্ধে লর্ড ক্যানিং সরকারী রিপোর্টে লেখেন, "I assure you that for about a week it caused me more anxiety since the days of Delhi from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in lower Bengal in flames."[১২]

বৃটিশ সরকারের রেকর্ডই প্রমাণ করছে যে, উক্ত দু'টি বিদ্রোহ লুটেরাদের বিদ্রোহ ছিল না। ছিল সুসংগঠিত ইতিবাচক লক্ষ্যাদর্শগত বিদ্রোহ। উভয় বিদ্রোহ ছিল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উভয় ধর্মের উৎপীড়িত শোষিত জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। উভয় সম্প্রদায়ের এলিট (elite) শ্রেণী নীল বিদ্রোহের বিপক্ষে ছিলেন। তারা বিদ্রোহ দমনে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতাও করেছিলেন। ইতিহাসে এসব সহযোগিতাকারীদের নাম আছে।

তাই উপরিউক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে, বাংলাদেশের সমাজ জীবন উত্তর ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র ছিল না :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কিছু ব্যাপারে তার আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা ১৯৭১ সালে দেখেছি।

ধর্ম বিশ্বাসে এক হোক বা বহু ধর্মাবলম্বী হোক, ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্ব হতেই বহু জাতির বাসভূমি। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কখনও হয়নি। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার দু'টি বিবদমান এলিট রাজনৈতিক দলের কাছে আপসে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে। তার ফলে পাকিস্তান হলো একটি ক্ষুদে সাম্রাজ্য। ভারত হলো একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র যাকে এ যুগের সাম্রাজ্য বলা যায়। ভারতের ইতিহাসে বাংলাদেশের বাঙালী জাতিই সর্বপ্রথম জাতিক-রাষ্ট্র স্থাপনের জন্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। বাংলাদেশই প্রকৃত অর্থে উপমহাদেশের প্রথম জাতিক-রাষ্ট্র।

৩

সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ করলাম। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উক্ত প্রতিটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করেছে। তা সত্ত্বেও, বাঙালী জাতিকে বারবার শুরু থেকে শুরু করতে হচ্ছে কেন? কেন বেশ কিছু দূর এগিয়ে সমাজ জীবন আবার পূর্বের স্থানে পশ্চাদ্ধাবন করে—যেখান থেকে যে বিন্দু থেকে তারা অভিযাত্রা শুরু করেছিল সেই বিন্দুতে ফিরে যায়? এ বিষয়ে যখন ভাবি তখন আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণীয় শ্রেণীটির মধ্যে ইংরেজ আমলের আগেও বিদ্যাচর্চা ছিল। বাংলাদেশে অভিজাত (আশরাফ) শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুবই কম, যারা ছিলেন তাদের মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন বহিরাগত অবাঙালী। বাংলা তাদের মাতৃভাষা ছিল না, বাংলার চর্চাও তারা করতেন না। সুতরাং জাতিক চেতনা তাদের মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, ইংরেজী ভাষার প্রতি তারা ছিল পরাঙ্মুখ। সংখ্যার বিচারেও উচ্চবর্ণীয় হিন্দু শ্রেণীটি ছিল বেশ বড়। এই শ্রেণীটি সকলের আগে ইংরেজী ভাষা শিখতে শুরু করে। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ওরা শিল্প বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-নীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। ইয়োরোপে তখন জাতিক রাষ্ট্র গঠন সমাপ্ত প্রায়। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সমাজ এ কালে জাতি বলতে কি বোঝায় তা জানতো, বুঝতো। বাঙালী যে একটি আলাদা জাতি সে বোধও অনেকের মধ্যে ছিল। বাংলা সাহিত্যে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু তারা যখন সাহিত্যে রাজনীতি এবং সামাজিক জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনলেন তখন দেখা গেল, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরই শুধু বাঙালী জাতিরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অপরদিকে, নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও আদিবাসী শ্রেণী হতে ধর্মান্তরিত বিপুল সংখ্যক মুসলমান এদের সৃষ্ট সাহিত্যের বাইরে রয়ে গেল। সমাজে তাদের অবস্থান রইল, কিন্তু তাদের সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধ হলো না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে বাংলাদেশে বসবাসকারী আশরাফ শ্রেণীর অবাঙালী মুসলমানগণ ইয়োরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা কলেজ স্থাপন করলে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষার জন্যে সেখানে যেতে থাকে। অপরদিকে, বাংলার নিরক্ষর চাষী মুসলমানদের হেদায়েত অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্যে আসতে শুরু করে বিহার, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের উর্দুভাষী মুসলিম প্রচারক। অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল হতে ১৯০০ সাল এই দেড়'শ বছর সময়ের মধ্যে কয়েক কোটি খাঁটি বাঙালী মুসলমানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক, এমনকি ধর্মীয় নেতৃত্বও চলে যায় অবাঙালী অথবা বাঙালিত্ব বর্জনকারী মুসলমানদের হাতে। সাধারণ মুসলমান সমাজের মস্তিষ্ক শোধন হতে লাগল : অবিরত একতরফা প্রচার মানুষকে প্রতিবর্তীক্রিয়ার শিকার করে। স্মরণীয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জার্মান জাতিকেও হিটলার-গোয়েবলস অবিরত মিথ্যা প্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। জার্মান জাতি হয়ে পড়ে হিটলারের গিনিপিগ। এখনও তারা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে বাঙালী মুসলমান সমাজে ইয়োরোপীয় শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকলেও তারা অবাঙালী নেতৃত্বের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি।

এ হলো বিষয়টির একদিক। অপরদিকে ইতিপূর্বে আমি যে "বাঙালীর সমন্বিত লোক-সংস্কৃতির" কথা বলেছি তার মধ্যেও দুর্বলতা ছিল। লোক-সংস্কৃতিতে কোনো বিশেষ ধর্মের মৌলবাদ স্থান পায়নি ঠিক। কিন্তু ইহজগতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রয়োজনে উদ্ভূত এই লোক-সংস্কৃতিতে প্রেম-ভক্তিবাদী উপাদানের প্রাধান্য ছিল। গুরু এবং পীরেরা ইহলোকে অর্থবিত্ত, সুস্বাস্থ্য এবং পরলোকে বেহেশতের দ্বার খুলে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন---এই ছিল ব্যাপক বিশ্বাস। গুরু ও পীরেরা এ আস্থা জনমনে দৃঢ় করার জন্যে যা কিছু করা প্রয়োজন তা করতেন, এখনও করছেন। তার ফলে সাধারণ মানুষের মনে গণশক্তির চেয়ে ব্যৈক্তিক শক্তির উপর অধিক আস্থা জন্মে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা বিস্তার লাভ করে। বিগত সত্তর আশি বছরের রাজনীতিতে আমরা ব্যৈক্তিক নেতৃত্বের প্রাধান্য দেখে আসছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য একটি দিক হচ্ছে : নগর সংস্কৃতি বনাম লোক-সংস্কৃতি। এ কথা সত্য যে, নগর সংস্কৃতি ও সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ। এবং নগরবাসীরাই দেশ পরিচালনা করে। বাংলাদেশে কোনো আমলেই স্থায়ী বড় নগর গড়ে ওঠেনি—পূর্ব বাংলায় এক ঢাকা ব্যতীত অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য নগর ছিল না। সুতরাং নগর সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে এদেশবাসী অপরিচিত ছিল। ছোট ছোট তথাকথিত শহরে যারা বাস করতেন তাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল পল্লীগ্রাম, মানমর্যাদার সঙ্গে স্থাবর সম্পত্তির সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশে কলকাতাই প্রকৃত অর্থে প্রথম বড় শহর এবং তিন চার শতাব্দীকালের মধ্যে সেখানে নগর সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু তার মধ্যেও দুর্বলতা ছিল। কলকাতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে লোকায়ত উপাদানের চেয়ে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক উপাদান ছিল বেশি। যানবাহনের উন্নতি, সংবাদপত্রের উদ্ভব ও প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা কেন্দ্রিক নগর-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সবগুলো উপাদান পল্লীগ্রামে প্রবেশ করতে থাকে। তার ফলে বাঙালীর সমন্বিত লোক-সংস্কৃতির অবক্ষয় দু'দিক থেকে শুরু হয়। প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের শ্রেণী বৈষম্য সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ নগর সংস্কৃতি ও সভ্যতার যেগুলো খারাপ দিক সে-গুলোও গ্রামে প্রবেশ করে।

এ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। তার মধ্যে মুসলমান শরিক হয়নি বললেই চলে। ১৯১৯-২১ সালের আন্দোলনে ইহজাগতিক লক্ষ্যাদর্শের সঙ্গে ধর্ম যুক্ত হয়। মহাত্মা গান্ধীর লক্ষ্যাদর্শ ছিল রামরাজত্ব স্থাপন। মুসলমান চাইল তুর্কী খেলাফতের পুনরুদ্ধার। ফলে সে সময়ের গণঐক্য অল্পকালের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৩০-৩৩ সালের পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনেও উনিশ-একুশের ব্যাপক ঐক্য দেখা দেয়নি। ১৯৩৬ সালের মধ্যে ঐক্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৪৩ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬-৪৭ এর ভারতব্যাপী মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লাখ লাখ লোকের প্রাণহানি এবং কোটি কোটি মানুষের ভিটে মাটিহীন উদ্বাস্তু হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে ভারত বিভাগ এবং বঙ্গভূমির অঙ্গচ্ছেদ ঘটে। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে সমাজ হতে মানবিক গুণাবলী (ethics and morality) বিদায় গ্রহণ করতে থাকে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্প্রসারিত হয়। এই দু'টি শ্রেণীর সমন্বয়ে যে এলিট (elite) শ্রেণী তৈরী হয় তার মধ্যে আভ্যন্তরীণ দলাদলি ছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে ঐক্য ছিল, সেটি হচ্ছে এদের বেশীর ভাগ ছিলেন মূলত unscrupulous opportunist অর্থাৎ নীতিজ্ঞানহীন সুবিধাবাদী। অপরদিকে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মতন্ত্র মোনাফিকদের মুখোসে পরিণত হওয়ার ফলে ধর্মীয় নীতিজ্ঞানও সমাজ হতে লোপ পেতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ সালে মিঃ জিন্নাহর ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালনকারী পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ঘাড়ে গর্দানে চোখে মুখে বুকে বুমেরাং হয়ে পতিত হতে থাকে। তিরিশ লাখ বাঙালী হত্যা, ব্যাপকভাবে নারী নির্যাতন, লুঠপাট, বাড়ীঘর ও শস্যক্ষেত্র ভস্মীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রমাণ করে যে, ধর্মের স্লোগান ছিল প্রকৃত পক্ষে পূর্ববঙ্গকে স্থায়ী কলোনীতে পরিণত করার হাতিয়ার ও কৌশল মাত্র। ১৯৪৮-৫২ সালে বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির উপর হামলা ছিল তারই প্রস্তুতি।

৪

১৯৭১ সালের যুদ্ধের ফল উপমহাদেশের প্রথম ভাষাভিত্তিক ধর্ম-নিরপেক্ষ স্বাধীন জাতিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। নিঃসন্দেহে, এটি গর্বের বিষয় এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি যুগ পরিবর্তনকারী ঘটনা। কিন্তু তার একটি অপর পিঠ আছে। বাংলার সাধারণ মানুষ আর কখনও যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে বসবাস করেনি। গোটা পূর্ববঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। নিরক্ষর সাধারণ মানুষ সাদা চোখেই দেখতে পায় যে, ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, পাপপুণ্য প্রভৃতি নামে পরিচিত নীতিবোধ স্থায়ী কোনো বস্তু নয়। শাসক শ্রেণীর মর্জিমতো তা পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ ন'মাস সময়ের মধ্যে তিরিশ লাখ মানুষের প্রচলিত ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধও সমাধি লাভ করে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অধ্যায় রচিত হল। অথচ সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত হতে না হতেই দেখাগেল এ্যাবাউট টার্ন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে যারা সিংহাসন দখল করলেন তারা ধর্ম-নিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনাটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সংবিধান হতে মুছে ফেললেন। মুছে ফেললেন রাষ্ট্রীয় চার লক্ষ্যাদর্শ। আশ্চর্যের বিষয়, গৃহযুদ্ধ হলো না। ধর্মনিরপেক্ষ জাতিক চেতনার উৎপ্রেরণাবশে যে বৃহৎ রাজনৈতিক দলটি স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল সেটিও এই এ্যাবাউট টার্ন নীরবে মেনে নিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম ঘটনা বিরল। গলদটাতো সমাজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু কোন স্তরে? কোন শ্রেণীর মধ্যে? ১৯৭৫ সালের পর ১৩ বছর চলছে। এখন তো মনে হচ্ছে, আমরা বিশের দশকে ফিরে গেছি। কাজী নজরুল ইসলাম "বিদ্রোহী" কবিতা লিখেছিলেন। তাকে "কাফের" খেতাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হলে প্রাণে বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। ১৯৪০-৪৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জজবার চেয়ে আজকের জজবা কম ভয়াবহ নয়। একদিকে ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় মৌলবাদের পক্ষে জনমত আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে তাদের সাফল্যও উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষিত ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সরকারী কর্মচারী, বিভিন্ন বাহিনীর লোক, এমনকি অধ্যাপক শ্রেণী হতেও ওরা লোক সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওরা হিটলারের অনুকরণে একটি বেশ বড় ধরনের ফ্যাসিস্ট-ঝটিকা বাহিনী (Storm Troops) গঠন করেছে। এই ঝটিকা বাহিনীও শিক্ষিত ছাত্র যুবকদের নিয়ে গঠিত। ওরা ধর্ম রক্ষার নামে স্থানে স্থানে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী এমন কি সাধারণ মানুষের উপরও আক্রমণ শুরু করেছে। আলামত ভালো নয়। কিন্তু বাঙালী সমাজেই এর বীজ উপ্ত না থাকলে শুধু বিদেশী অর্থে এ ধরনের প্রাইভেট বাহিনী তৈরী করা যায় না। এবং কারা করছে? করছে যারা ১৯৭১ সালের গণহত্যায় পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল যারা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়নি তারা। ব্যারামটা কোথায়? সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবণতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলে এ ব্যাধির উৎসস্থলও আবিষ্কার করা সম্ভব। এ কাজ সমাজবিজ্ঞানীর।

আমি কখনও কখনও একটি বিষয় ভাবি। খৃস্টীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের মত ইসলামও একটি বিশ্বধর্ম। উদ্ভবস্থল যাই হোক, বিশ্ব ধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীর সর্বত্র কমবেশি সংখ্যায় বসবাস করছে। কালক্রমে উদ্ভবস্থল গৌণ হয়ে গেছে। ধর্ম হয়ে গেছে যার যার দেশীয় ধর্ম : জাতি ও ধর্মের মধ্যে বিভেদ নেই। জাতি ধর্ম এবং ভাষা মিলে এক অভিন্ন ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। ভেদাভেদ আছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। মনে হয়, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এখনও জাতি ধর্ম ও ভাষার সমন্বয় সাধিত হয়নি। পশ্চিম হতে ধর্ম এসেছে। সুতরাং খাঁটি ইসলাম এবং খাঁটি মুসলমান বাংলাদেশের পশ্চিমে আছে, আরবি ভাষাও পশ্চিমী ভাষা, অতএব পবিত্র। এ রকম একটা ধারণা বোধ করি এখনও মুসলিম সমাজে আছে। আগেই উল্লেখ করেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাঙালী মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছে উর্দুভাষী অবাঙালী মুসলমান। মাঝখানে দশ পনর বছর বাঙালী মুসলমান কিছুটা নড়াচড়া করেছে। ১৯৩৬ সাল হতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়টার মূল নেতৃত্ব পুনরায় পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের হাতে চলে যায়। ১৯৫৪ সালে কিছুদিনের জন্যে বাঙালী মুসলমান নেতৃত্ব দেয়। ১৯৫৮ সাল হতে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সময়টায় বাঙালী মুসলমান সমাজ পুনরায় পশ্চিমী নেতৃত্বধীন হয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সাল হতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ পুনরায় বাঙালীর নেতৃত্বাধীন হয়। ১৫ই অগাস্টের পর হতে পুনরায় পশ্চাদ্ধাবন শুরু হয়েছে। এখন বাংলাদেশ নামেই স্বাধীন। তার অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সব কিছুই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহযোগী বন্ধু মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো আরবি ভাষাভাষী রাষ্ট্রের নির্দেশাধীন।

১৯৭১ সালের যুদ্ধটা কি তাহলে নিছক আত্মরক্ষার ব্যাপার ছিল? এ রকম সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। তার মধ্যে ইতিবাচক জাতীয় চেতনাও ছিল। কিন্তু ধর্ম, ভাষা এবং জাতীয়তাবোধের যে সমন্বিত চেতনা এ্যাবাউট টার্ন রোধ করতে পারে সেরূপ ইস্পাতদৃঢ় শক্তি তার মধ্যে ছিল না।

তাছাড়াও অন্য একটি বিষয় সম্বন্ধে ভাবতে হয়। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলিম শ্রেণীর যতটুকু বিকাশ হয়েছিল সেটাকে আমরা স্বাভাবিক বিকাশ বলতে পারি। ১৯৩৭ সাল হতে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে যে সম্প্রসারণ ঘটে তার ভিত্তিমূলে রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনাখুনি, লুটপাট প্রভৃতি যাবতীয় অনাচার। স্বাধীনতা লাভের পরেও উক্ত অনাচার অব্যাহত গতিতে চলেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্টের পরে তা আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। সুতরাং ডঃ নাজমুল করিমের Changing Society in India and Pakistan এবং ডঃ রঙ্গলাল সেন-এর Political Elites in Bangladesh গ্রন্থদ্বয়ে আমরা বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত যে রাজনৈতিক এলিট শ্রেণীটি দেখছি তার বিকাশকালটায় কোনো লক্ষ্যাদর্শগত ভিতভূমি ছিল না বললে সম্ভবতঃ খুব একটা বড় রকমের ভুল করা হবে না। তাই আমরা শুধু বারবার শুরু হতে শুরু করার বিস্ময়কর ঘটনাবলী দেখছি না, আরো একটি কৌতুকপ্রদ দিক দেখছি। শহর বন্দর ও পল্লীগ্রাম সর্বত্রই পাশাপাশি অবস্থান করছে নৈতিক অরাজকতা, নির্লজ্জ "vulgar materialism" প্রভৃতি এবং ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিষ্ঠার জজবা। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এই যে 'কন্ট্রাডিকশন' চলছে তার মূলে কি আরো কোনো কারণ আছে? ইবনে খালদুনের আল মুকাদ্দিমা'র একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম "বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর বৈশিষ্ট্য, পরিচ্ছদ, পেশা এবং অন্যান্য যাবতীয় অবস্থা এবং অভ্যাস-এর অনুকরণ করে"। ইবনে খালদুন উক্ত পরিচ্ছেদের শিরোনাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "ইহার কারণ এই যে, জীবাত্মা সর্বদাই তাহার উপর প্রাধান্য বিস্তারকারীর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে আস্থাবান এবং তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। এ ব্যাপারে পূর্ণতার গুণাবলীর প্রতি তাহার মধ্যে যে শ্রদ্ধা সমীহতার ভাব আছে উহার অথবা সে ভুল করিয়া বিজয়ীর প্রতি তাহার আনুগত্যকে স্বাভাবিক প্রাধান্য বিস্তারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফল নহে, বরং পূর্ণতর গুণের আকর্ষণ—এইরূপ ধারণার বশবর্তী হয়। এই শেষোক্ত ভুলটি যখন সে করিয়া বসে ও বিজয়ীর সংস্পর্শে আসে তখন এটা তার বিশ্বাসে পরিণত হইয়া বিজয়ীর সমস্ত মত ও পথ গ্রহণে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহাই অনুসরণ নামে খ্যাত। অথবা এমনও হইতে পারে, আল্লাহই ভাল জানেন, সে দেখিতে পায়, বিজয়ীর প্রাধান্য বিস্তার কোনো গোত্রপ্রীতি বা সামরিক শক্তির ফল নহে, বরং উহা একান্তই তাহার চারিত্রিক গুণ ও ধর্মীয় বিশ্বাসাদির কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তখন সে আবারও ভুল করে এবং এই ভুল তাহার পূর্বোক্ত প্রথম ধারণাকে অধিকতর মজবুত করে। পাঠক সম্ভবতঃ এই কারণেই দেখিতে পান যে, বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর অনুকরণ করিয়া থাকে ..... ইহা সন্তান-সন্ততির মধ্যেও সংক্রমিত হয়, কেননা তাহারা পিতামাতাকেই অনুসরণ করে।"

যে রাজনৈতিক এলিট (elite) শ্রেণীটি এখন বাংলাদেশ শাসন করছে অথবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে তার উদ্ভব ব্যাপক দুর্নীতির মধ্য হতে। তার মস্তিষ্কে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বহুকালের দাসত্ববোধ বিদ্যমান। দেশে বহু সংখ্যক অর্থনৈতিক শ্রেণী আছে ঃ শ্রমিকের সংখ্যা সম্ভবতঃ পঁচিশ ত্রিশ লাখ। আছে দেড় কোটি নিঃস্ব ক্ষেতমজুর এবং অগণিত প্রান্তিক চাষী পরিবার। কেরানী, ছোট ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্তদের নিয়ে গঠিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও আছে। আছে অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে গঠিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও।

তবু আমরা বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে ব্যর্থ প্রমাণিত প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে তখন নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক এলিট শ্রেণী তাদেরকে নানা কৌশলে থামিয়ে দিয়েছে। এটা বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে পার পাওয়ার শক্তি তারা পাচ্ছে কোথায়? তা'হলে কি এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় না যে, শোষিত নিপীড়িত জনগণের শ্রেণী-চেতনা এখনও দুর্বল। শ্রেণীত্যাগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব এখনও হয়নি। অথবা হলেও জনগণকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো শক্তি এখনও তারা অর্জন করতে পারেনি। তা'ছাড়া, সকল শ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী যখন ঐক্যবদ্ধ তখন তারা বিভক্ত। সময় সময় যে গণবিদ্রোহ দেখা যায় সেটা কি উত্তেজনার মুহূর্তে Crowd এর আচরণ? এ প্রশ্নটিও মনে জাগে। বাংলাদেশে এখন অসংখ্য রাজনৈতিক দল। কিন্তু যত দলেই বিভক্ত দেখছি না কেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক এলিট শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শগত বিরোধ নয়। বিরোধটা ক্ষমতা ও সুবিধা ভাগাভাগি সংক্রান্ত। ব্যতিক্রম আছে অবশ্যই। কিন্তু সে সব দল এখনও দেশকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো শক্তি অর্জন করতে পারেনি।

জনকল্যাণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানীগণ বাঙালী জাতিকে বারবার শুরু হতে শুরু করার পঙ্কাবর্ত হতে উদ্ধার করার দিক নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন-এই আশাবাদ নিয়ে শেষ করছি।

জয় বাংলা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. A. L. Fisher, *A History of Europe*, Vol. I, pp. VIII. Quoted in *Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy*, Progress Publishers, Moscow, pp. 463.

২. *The Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy*, pp. 465.

৩. Ibid, p. 472.

৪. বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আল-মুকাদ্দিমার "আলোচনা" অংশের ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫. Sorokin, *The Crisis of Our Age*, pp. 22-23.

৬. Ibid, p. 26.

৭. Sorokin, *The Crisis of Our Age*, Foreword, May, 1957.

৮. Hegel, *Philosophy of History*, Part IV, "The German World.-" এর প্রথম বাক্য দ্রষ্টব্য।

৯. "বাঙালীর সমন্বিত লোক-সংস্কৃতি" শীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০. Abu Jafar Shamsuddin, Sociology of Bengal Politics. and Other Essays, 2nd edition, p. 8. Quoted from Sannyasi and Fakir Raiders of Bengal by J. M. Ghose

১১. প্রাগুক্ত পৃ.-১১

১২. প্রাগুক্ত পৃ.-১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহজাগতিকতা

ইহজগতের ইহজাগতিক জৈব প্রক্রিয়ায় আমাদের জন্ম। সপ্রাণ জীবরূপে ইহজাগতিক পারঙ্গমতা অনুযায়ী কেউ সংশয়মুক্ত পাকা বাড়ীঘরে বিলাস ব্যসনের মধ্যে, কেউ দীনতার মধ্যে পর্ণকুটিরে, কেউ রাজ সড়কের পদপথে মানবেতর প্রাণীর ন্যায় কিন্তু সবাই ইহজগতেই বসবাস করি। ইহজগতে লব্ধ জল বায়ু এবং আহার্য ব্যতীত আমরা বাঁচতে পারি না। দেখা সাক্ষাতের সময় একে অপরকে জিজ্ঞাসা করি ঃ কেমন আছেন ? প্রত্যুত্তরে বলি ঃ ভালো আছি বা ভালো নেই। উভয়েই জানি ঃ এই ভালোমন্দ ইহজাগতিক। সামাজিক পারিবারিক এমন কি ব্যৈক্তিক সুখ-দুঃখবোধও ইহজাগতিক। ইহজগৎকে কেন্দ্র করেই আমরা সুখস্বপ্ন রচনা করি। নিদ্রিতাবস্থায় নানা রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি. কিন্তু ইহজগতের বাইরে যাই না—যেতে পারি না। স্বপ্নে পাখা গজায়। কখনও ঐ পাখার সাহায্যে পাখা ব্যতিরেকেই উড়ি। কিন্তু আকাশটাও যে ইহজগতে। কাজেই তার বাইরে গমন হয়ে ওঠে না। মরিও ইহজগতে। প্রক্রিয়া এবং প্রথা যাই হোক শবদেহ ইহজগতেই লয় পায়—সংক্ষেপে জন্ম, মৃত্যু এবং জন্ম ইহজগতেই। হেগেলীয় ডায়েলিকটিকসের সঙ্গে তুলনীয় এ-এক অলংঘনীয় আইন। আমাদের সকল কাজকর্ম ইহজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কৃষি করি ইহজগতে, কলকারখানায় নানা জিনিস তৈরী করি ইহজগতের প্রয়োজনে ইহজগতে, মারণাস্ত্রের সাহায্যে মহোল্লাসে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী হত্যা করি ইহজগতে, সমাজবদ্ধভাবে মানব জীবন যাপন করি ইহজগতে, শিল্প সাহিত্যও করি ইহজগতে, আধ্যাত্মিক সাধনা করি পঞ্চেন্দ্রিয় প্রয়োগ করে ইহজগতেই। এমন কি মৃতের আত্মার কল্যাণকামনায় শ্রাদ্ধ চেহলাম ইত্যাদিও ইহজগতেই করি। পুরোহিত মৌলভী মুনশী পৃথিবী পৃষ্ঠেই আহার্য এবং দক্ষিণার বিনিময়ে মন্ত্রতন্ত্র দোয়া কালাম পাঠ করেন। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সভাসমিতি ইহজগতেই হয়। বক্তৃতা করা হয় ইহজগতের ভাষায়। সাহিত্যও রচিত হয় মানবাবিষ্কৃত শব্দাবলীর সহায়তায়। অদৃশ্য পরলোক সম্পর্কিত যে সব বিবরণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসমানী কেতাবে পাওয়া যায় তার ভাষা ইহজগতে বসবাসকারী মানবজাতির ভাষা। ইহজগতে অলভ্য অথবা অকল্পনীয় কোনো বস্তু ওসব বিবরণে নেই। স্বর্গ স্বচ্ছ স্রোতো-স্বিনী এবং চিরহরিৎ উদ্যান সমৃদ্ধ এক অতি সুখের কর্মমুক্ত জগৎ। নরক প্রজ্জ্বলিত হুতাশন। একটিতে চরম ইহজাগতিক অফুরন্ত সুখ, অপরটিতে চরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহজাগতিক অফুরন্ত যন্ত্রণা। উভয়ই কর্মমুক্ত স্থান। অবস্থান আছে কিন্তু কর্তা, কৃত্য ও কর্ম নেই। দায়দায়িত্ব এবং কর্তা-কর্ম-সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ইহজাগতিক ব্যাপার। মানুষ সম্ভবতঃ শ্রমমুক্ত জীবনকেই পরম ও চরম সুখ জ্ঞান করে। তাই স্বর্গে নিরবধি অবসরের কল্পনা। এই দুর্লঙ্ঘ্য এবং ভয়াবহ স্বাভাবিক (natural) আইনকানুনের মধ্যে সুদূর অজানা অতীতে জন্মলগ্ন হতে প্রাণীজীবন ধারণ এবং সর্বপ্রকার জৈবধর্ম পালন সত্ত্বেও ইহজাগতিকতা কি বস্তু তা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। এটাকে মানব জীবনের ক্রূর পরিহাস বলবো না কি কৌতুকক্রীড়া বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু পাঠক সম্ভবতঃ আরো কিছু জানতে চান। তবে বিদগ্ধ জনকে আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি, ইহজাগতিকতা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাভাবিক নৈসর্গিক আইন বিধায় আমার রচনায় অভিনবত্বের আশা করবেন না। মানব চিন্তার বিবর্তন, ক্রমবিকাশ এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক জীবনের একটি ধারাবাহিক ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু আমার এ প্রবন্ধে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী আমি নই। ইহজগতে লব্ধ বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা হতে অজ্ঞাত বস্তু পরিবেশন করা অসম্ভব।

উপরের সামান্য ভূমিকা থেকেই সম্ভবতঃ উপলব্ধ হয়ে থাকবে যে, ইহজাগতিকতা একটি বোধ (concept)। এই বিশেষ বোধের দু'টি দিক আছে। একটি তার তত্ত্বীয় (theoretical) দিক। অপরটি তার ব্যবহারিক (operational) দিক।

প্রাগৈতিহাসিক মানব জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। মর্গান, ম্যালিনস্কি প্রমুখ পণ্ডিত অনুন্নত মানব সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ওসব তথ্যের উপর নির্ভর করে তারা এবং সমকালীন অন্যান্য পণ্ডিতগণ মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু কিছু সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ একটি ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, নানা প্রকার নৈসর্গিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করে মানবজাতি আদিম বর্বরতার (Savagery) যুগ হতে বর্বরতার (Barbarism) এবং বর্বরতার যুগ হতে সভ্যতার যুগে প্রবেশ করে। এই সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী সংগ্রামকালে তারা প্রতিকূল প্রকৃতিকে বশীভূত অথবা বলা যায়, অনুকূল করার জন্যে যুগপৎ দু'টি কৌশল অবলম্বন করেছে। ইহজগতে বাঁচার স্বাভাবিক জৈবধর্মই তাদিগকে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ে জয়ী হওয়ার কৌশল উদ্ভাবনে করেছে অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা, মেলিতেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংকুরের পাখা, লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।" কিন্তু বীজ অংকুরের পাখা মেলেই খালাস। তার বৃদ্ধি ও লয় স্থবিরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বৃক্ষ-লতার জন্য ওটাই নৈসর্গিক আইন। 'মানুষ' প্রাণীজগতের মধ্যেও ব্যতিক্রমধর্মী জীব। চলার তাগিদ, দেখা এবং বোঝার ঔৎসুক্য তার জন্মগত স্বভাব। উপরে দু'টি কৌশলের কথা বলেছি বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা অভিন্ন লক্ষ্যার্জনের নিমিত্ত অনুসৃত একটি সমন্বিত (integrated) কর্মসূচীর সাঁড়াশি সদৃশ দু'টি বাহু। প্রথমতঃ মানব জাতি যথাসম্ভব কম শ্রমে এবং কম ঝুঁকি নিয়ে তার আহার্য সংগ্রহ এবং শীতাতপ ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্যে নানাবিধ হাতিয়ার, যন্ত্র এবং নিরাপদ আশ্রয় নির্মাণকৌশল উদ্ভাবন করেছে। দ্বিতীয়তঃ সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাদিগকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে ব্যৈক্তিক শ্রমের চেয়ে পারিবারিক শ্রম এবং পারিবারিক শ্রমের চেয়ে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ যৌথ শ্রমে উক্ত লক্ষ্যাবলী অর্জন সহজতর। যৌথ প্রচেষ্টার অলংঘনীয় আবশ্যকতা উপলব্ধ হওয়া মাত্র মানবজাতি সুসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ করার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে। সুতরাং মানব সভ্যতা বিকাশ ও বিস্তৃতির মূল প্রেরণা আগেও যেমন এখনও তেমনি ইহজগতে মানুষের মতো বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই আসছে। এ কথাটাকেই পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিশেষভাবে কার্ল মার্কস—economic interpretation of history অর্থাৎ ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নাম দিয়েছেন। সকলে একমত হবেন কি না জানিনা, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি উৎপাদন ক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছে। এ বিশ্বাসের পক্ষে আমার যুক্তি অত্যন্ত সাধারণ। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'—একটি বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবাদ। ইহজগতে প্রাণে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তাবোধের পূর্বে মানুষ অন্য কোনো চিন্তা করতে সক্ষম নয়। এটা জৈবধর্ম। প্রমাণ আমাদের দেশের শতকরা ৬০ জন মানুষ। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কখনও কখনও তার চেয়েও দীর্ঘকাল তারা প্রতিদিন আহার্য সংস্থান কার্যে কঠোর শ্রমে নিযুক্ত থাকে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের জীবনে সুকুমার এবং উচ্চমার্গীয় চিন্তাভাবনা করার সুযোগ কোথায়? উন্নত হোক অনুন্নত হোক উৎপাদন প্রক্রিয়াই যে অন্ন বস্ত্র এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তদ্বিষয়ে দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তিগণ বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত আমাদের ন্যায় তথাকথিত বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকদের চেয়ে অনেক বেশী নিঃসন্দিগ্ধ। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইহজাগতিক আচরণ এবং সততঃ উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত তার জীবন এ সত্য প্রমাণ করে। সামাজিক পরগাছাদিগকে আমি মানব সমাজের কলঙ্ক মনে করি। তাদের উদ্ভবের ইতিহাস সুধীজনজ্ঞাত। তাই বিশেষ বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন রকমের সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(সমষ্টিক) বোধ এবং সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইতিপূর্বে ইহজাগতিকতাকে আমি একটি বোধ (concept) বলেছি এবং সেটাকে তত্ত্বীয় (theoritical) এবং ব্যবহারিক (operational) এ দু'টি ভাগে ভাগ করেছি।

যে কোন প্রকার উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই তার সম্ভাব্য পরবর্তী উৎপাদন পদ্ধতির বীজ উপ্ত থাকে—ডায়ালেকটিকসের (দ্বন্দ্ববাদী দর্শন) এ সূত্র মেনে নিলে আমাদিগকে এটাও স্বীকার করে নিতে হয় যে, বোধের (concept, ideas etc) জন্ম সমকালীন উৎপাদন পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই সম্ভব। বোধ এবং চিন্তা-ভাবনা কখনও নৈসর্গিক জগতের বাহির হতে আসে না। মানব-চিন্তা তার প্রতিবেশ ও পরিবেশজাত প্রতিক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু নয়। জাগতিক অস্তিত্ব অন্য কথায় অনাদি অনন্ত স্থান কালের বাইরে সপ্রাণ মানুষের অবস্থান অসম্ভব বিধায় মানব-চিন্তা সম্পূর্ণরূপে তার পারিপার্শ্বিক জীবন এবং নিসর্গ দ্বারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কবিত্ব তো বটেই উদ্‌ভ্রান্তের বিশৃঙ্খল বিস্রস্ত চিন্তাও তদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জীবৎকালে outsider হওয়া অসম্ভব।

অতঃপর আমরা ইহজাগতিকতাবোধ এবং তার পাশাপাশি অন্য বোধের (আদৌ থাকলে) ক্রমবিকাশ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারি। কৃষি জীবনের সূচনাকালকে আধুনিক মানব সভ্যতার প্রথম পর্যায় বলা যায়। নীলনদের তীরে মিশরে সর্বপ্রথম কৃষি জীবন শুরু হয়। মিশরবাসীরা গ্রহনক্ষত্রের উদয়াস্তের সম্পর্ক দেখতে পায়। আরো দেখতে পায় যে, লুব্ধক নক্ষত্রটি প্রথম দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীল নদীতে বন্যা শুরু হয় এবং ৩৬০ দিন পর তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। নীলনদের জোয়ারভাটা, বন্যা এবং তার অবসানকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন মিশরে চাষবাস শুরু হয়। মিশরীয় পুরোহিতগণ আসিরিসের মন্দিরে প্রতিদিন সকালে ৩৬০ ঘটি দুগ্ধ নৈবেদ্য প্রদান করতেন। বন্যা এবং তার নিরসন নক্ষত্রের আবির্ভাব তিরোভাবের উপর নির্ভরশীলজ্ঞানে প্রাচীন মিশরীয়রা নক্ষত্র পূজা শুরু করে। আকাশচারী নক্ষত্রপুঞ্জকে কৃষিকার্যের অর্থাৎ ইহজাগতিক জীবন ধারণের অনুকূল রাখতে হলে তাদিগকে তুষ্ট রাখা আবশ্যক—এ বোধ থেকেই নক্ষত্র পূজার জন্ম। বলা বাহুল্য চন্দ্র সূর্যও নক্ষত্র। শুধু মিশরে নয়, প্রাচীন বেবিলন, ভারতবর্ষ এবং গ্রীসেও ঐ একই কারণে চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, মেঘ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পূজার সূত্রপাত হয়। উক্ত প্রত্যেকটি বস্তু মানুষের ইহজাগতিক জীবন ও জীবিকার অত্যাবশ্যক সহায়ক। ঐ সকল শক্তিধর প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতীকরূপেই মূর্তিপূজার উদ্ভব। পূজার্চনা ও নৈবেদ্যদানের মধ্যে ইহজগতে খেয়েদেয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকার প্রেরণা ব্যতীত অন্য কোনো প্রেরণা খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যায় না। কল্পনাপ্রবণ মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চরম অবলুপ্তি মেনে নিতে চায় না। তাই ইহলৌকিক কাঠামোর আদর্শে একটি পারলৌকিক কাঠামোও সে সেই সুদূর অতীতেই তৈরী করে নেয়। সুতরাং ধর্মবিশ্বাসের প্রথম সূচনা ইহজাগতিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জৈব বাসনা হতেই। উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির আনুকূল্য প্রাতিকূল্য-নিরপেক্ষভাবে মানব জীবনের নিরাপত্তা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যত বেশী নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে তার ধর্ম বিশ্বাসও তত উন্নতি লাভ করেছে—পূজার্চনা ও উপাসনার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রাচীন যুগের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনেও উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরীয় ফেরাওদের ন্যায় পৃথিবীর প্রথম আইন প্রণেতা বেবিলনীয় রাজা হাম্মুরাবিও নিজেকে ঈশ্বরসুত মনে করতেন। রাজা হাম্মুরাবি সূর্যদেবের হাত হতে তাঁর আইনগ্রন্থ গ্রহণ করছেন। এভাবে আইনগ্রন্থ প্রাপ্তির একটি প্রতীকমূর্তিও তিনি বিশ্ববাসীর জন্য রেখে গেছেন। মুসা পর্বতশীর্ষ হতে অবতরণ করার সময় ইসরাইল গোত্রের ঈশ্বরের নিকট হতে আইন-কানুন সম্বলিত দু'কিত্তা লিখিত দলিল (tablets) হাতে করে নিয়ে আসেন। উল্লেখ্য যে মুসার ঈশ্বর অত্যন্ত অধিকার সচেতন। আইনলঙ্ঘনকারীকে মুসার ঈশ্বর যখন তখন স্বহস্তে smite অর্থাৎ বধ করেন।

এখানে হাম্মুরাবি এবং পরবর্তীকালে মুসা প্রবর্তিত ঐশ্বরিক আইন-কানুনের কিঞ্চিৎ তুলনামূলক বিশ্লেষণ আবশ্যক মনে করছি। হাম্মুরাবির আইনে স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভৃত্য, ব্যবসায়ী, উদ্যান মালিক, রায়ত, মেষপালক, সর্বশ্রেণীর বেবিলনীয় নাগরিকের দায় দায়িত্ব এবং অধিকার যেমন নির্ধারিত তেমনি আইনভঙ্গকারীর জন্যে ইহজগতে কঠোর দণ্ডের বিধানও আছে। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত এবং হাত পা'র বদলে হাত পা, এই হচ্ছে হাম্মুরাবির ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন। কারো ষাড় অন্য লোককে গুতিয়ে জখমি করলে ষাঁড়ের মালিককে মোটা জরিমানা দিতে হতো। হাম্মুরাবির আইনে দ্রব্যমূল্য, মজুরী, নৌকো, গাড়ী, শস্য মাড়াইর গরু প্রভৃতির ভাড়াও নির্ধারিত ছিল। এমন কি ডাক্তারের ফি এবং ইষ্টক নির্মাতা, দর্জি, ছুতোর ও অন্যান্য কারিগরের আজুরাও নির্দিষ্ট করা ছিল। পলাতক দাসকে আশ্রয়দানের দণ্ড ছিল অত্যন্ত কঠোর। ইসরাইলী আইন-কানুন আরো ব্যাপক এবং প্রায় সর্বগ্রাসী। রজস্বলা স্ত্রীলোক কর্তৃক পালিতব্য বিধিবিধান হতে শুরু করে পুংলিঙ্গের বাড়তি ত্বক ছেদন, খাদ্যাখাদ্য নির্দিষ্টকরণ, বৈবাহিক সম্পর্ক, রাজার প্রাপ্য প্রভৃতি প্রায় সব বিষয়েই ইসরাইলী আইনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধি বিধান বিদ্যমান। তাছাড়াও রয়েছে চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, প্রতিবেশীর সম্পত্তি গ্রাস প্রভৃতি অপরাধের জন্য দণ্ডের বিধান। দণ্ড এবং তার বিধান হাম্মুরাবির দণ্ডবিধি আইনের প্রায় অনুরূপ। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। ঈশ্বর এক ধরনের আইন পরপর দু'জনের হাতে তুলে দিলেন কেন? দু'ব্যক্তির ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা দু'রকম হলে আইনগুলোও দু'রকম হতে পারতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম শরিয়তী আইনের প্রায় সব কিছুই হয় অবিকলভাবে অথবা সংশোধিতভাবে ইসরাইলী সূত্র হতে আগত। এখানে একটি মাত্র ক্ষুদ্র মন্তব্য করতে চাই। হাম্মুরাবি এবং ইসরাইলী রাজ-রাজড়াগণ (তাঁরা ইসরাইলী পয়গম্বরও বটেন) কর্তৃক আইন-কানুন সম্বলিত লিখিত গ্রন্থ খোদ ঈশ্বরের নিকট হতে প্রাপ্ত বলার কারণ যাই হোক—খুব সম্ভবত ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বকারীরূপে সাধারণের আস্থালাভের উদ্দেশ্যেই এ কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকবে, অথবা তারা নিজেরাই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকে ঐশীশক্তি জ্ঞান করে থাকবেন-এ যুগেও কবিত্ব শক্তিকে ঐশী দান মনে করা হয়—উক্ত আইন-কানুন সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঈশ্বরাধনার নির্দেশাবলী ব্যতীত বাকী সমস্ত বিধি বিধান তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থাধীনে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল সামাজিক জীবন যাপন করার পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সমাজের অর্থনৈতিক ও মানসিক উন্নতি অনুযায়ী সংশোধিত অসংশোধিতভাবে অথবা সংকুচিত কিংবা সম্প্রসারিতভাবে ঐসব আইন-কানুন অদ্যাবধি প্রচলিত। কাজেই হাম্মুরাবির এবং ইসরাইলী আইন-কানুন 'ইহজাগতিক প্রয়োজনে ইহজগতে ইহজগদ্বাসী মানুষ কর্তৃক প্রণীত বিশেষ কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রমাণ-রূপেই বিচার্য। নির্ধারিত আইন-কানুন অনুযায়ী সুশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন প্রণালীকে যদি ঐতিহাসিক কালের সভ্য সমাজ-ব্যবস্থার সূচনা বলা যুক্তিযুক্ত হয় তা'হলে নিঃসন্দেহে হাম্মুরাবী এবং ইসরাইলী রাজ রাজড়াগণকে (পয়গম্বর), তারা ঐশী প্রতিনিধিত্বে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহজাগতিক রাষ্ট্র স্থাপনকারীরূপে গণ্য করতে হবে। স্বীকার করতেই হবে যে, ব্যক্তির খেয়াল খুশিপ্রসূত যখন তখন পরিবর্তনীয় ফরমানানুযায়ী শাসিত দেশকে স্থায়ী রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়া যায় না। ঐগুলোকে জমিদারি বলা যায়। জমিদারিতে বাহুবলই সত্য। পক্ষান্তরে—পক্ষপাতমূলক হলেও রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রচলিত।

এখন প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং গ্রীসের উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। কৃষি ভিত্তিক ঐতিহাসিক-কালীন প্রাচীন ভারতবর্ষে আমরা চতুবর্ণীয় আর্থ সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা প্রচলিত দেখতে পাই। ব্রাহ্মণ সেখানে শ্রেষ্ঠতম বর্ণ। জ্ঞানার্জন, বেদমন্ত্রোচ্চারণ, রাজ-রাজড়াদিগকে মন্ত্রণাদান, রাজ পৌরোহিত্যগিরি এবং ঐ সকলের বিনিময়ে ভূমি, গোধন, সোনাদানা গ্রহণ ও আইন-কানুন প্রণয়নের অধিকার ব্রাহ্মণের। ক্ষত্রিয়ের কাজ রাজ্য শাসন, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং যাগযজ্ঞাদি করা। বৈশ্যের জন্যে কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নির্ধারিত। শূদ্ররা সেবক এবং তাদের জন্যে যাবতীয় হীনকার্য নির্দিষ্ট---তাদের বসবাসের জন্যে আলাদা স্থান বরাদ্দ। এ সমাজেও দেখা যায়, যাবতীয় আইন-কানুন ইহ-জগদ্বাসীদের ইহজাগতিক লক্ষ্যার্জনের জন্যে প্রণীত হয়েছে। মনুসংহিতাকে হিন্দুর আদি আইন-তথা-ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। আজকের বিচারে গ্রন্থটিতে বহু বাহুল্য বস্তু বিদ্যমান। কিন্তু গ্রন্থটিতে ব্রাহ্মণের ধর্ম, কর্তার দায়-দায়িত্ব ও তাঁর প্রতি কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিদের কর্তব্য, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি বিধান, বিবাহ, স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম, অপরাধীর দণ্ড, শূদ্রধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ আছে সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করলে একমাত্র এ-সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, ইহজগতে চতুর্বর্ণীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে দৃঢ় এবং চিরস্থায়ী করার বিশেষ উদ্দেশ্যেই মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল। ওসব বিধি বিধানের প্রতি জনগণের বিশেষতঃ নিম্নবর্ণীয় লোকদের অন্ধ আস্থা উদ্রেক করে সমাজকে স্থিতিশীল রাখার বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণ মনুসংহিতাকে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দান করেন। মোট কথা ইহজগদ্বাসী মানব সমাজের ইহ-জাগতিক প্রয়োজনেই মনুসংহিতা রচিত হয়। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রাদি পাঠ করলে তার মধ্যে ইহজাগতিক জীবনের এত আধিক্য পরিদৃষ্ট হয় যে, ওগুলোর পারলৌকিক আবশ্যকতা সম্বন্ধে রীতিমতো সন্দেহের উদ্রেক হয়। বর্ণশ্রেষ্ঠরা মন্ত্রতন্ত্র, জ্ঞানচর্চা প্রভৃতি উচ্চ মার্গীয় কাজকর্মে লিপ্ত আছেন ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ অতিমাত্রায় ভোজন বিলাসী, সোমরস (মদ্য) পায়ী এবং অনুদান গ্রহীতাও। পৌরোহিত্য কর্মের প্রাপ্যও নির্দিষ্ট। ঐশ্বর্যশালী হওয়ার এমন সুযোগও কখনও কখনও ব্রাহ্মণ পেয়েছিল যে, "ব্রাহ্মণ পত্নীরা যাতে মুক্তা, মরকত, মণি, রূপা, রত্ন এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কার্পাস বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ববীজ, এবং কুষ্মাণ্ডলতাপুষ্পের পার্থক্য চিনতে পারেন সেই জন্যে একদল নাগরিক রমণীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল" (অতীন্দ্র মজুমদার-চর্যাপদ, পৃ. ১৫)। আজকের সমাজেও চরম বিলাস ব্যসনে লিপ্ত এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বহু দ্রব্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকরাই সাধারণতঃ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে "দিন ভিক্ষা তনু রক্ষায়" লিপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সচ্চরিত্র এবং ধর্মনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশ খয়রাত করেন। আইন-শৃঙ্খলাও শেষোক্তদের উপর প্রযোজ্য। অপরদিকে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে নায়কত্ব করতেন, যোদ্ধার জীবিকাও গ্রহণ করতেন (প্রাগুক্ত)। শূদ্রের অধ্যাপনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধি বিধান বিদ্যমান। তাছাড়াও রয়েছে চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, প্রতিবেশীর সম্পত্তি গ্রাস প্রভৃতি অপরাধের জন্য দণ্ডের বিধান। দণ্ড এবং তার বিধান হাম্মুরাবির দণ্ডবিধি আইনের প্রায় অনুরূপ। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। ঈশ্বর এক ধরনের আইন পরপর দু'জনের হাতে তুলে দিলেন কেন? দু'ব্যক্তির ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা দু'রকম হলে আইনগুলোও দু'রকম হতে পারতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম শরিয়তী আইনের প্রায় সব কিছুই হয় অবিকলভাবে অথবা সংশোধিতভাবে ইসরাইলী সূত্র হতে আগত। এখানে একটি মাত্র ক্ষুদ্র মন্তব্য করতে চাই। হাম্মুরাবি এবং ইসরাইলী রাজ-রাজড়াগণ (তাঁরা ইসরাইলী পয়গম্বরও বটেন) কর্তৃক আইন-কানুন সম্বলিত লিখিত গ্রন্থ খোদ ঈশ্বরের নিকট হতে প্রাপ্ত বলার কারণ যাই হোক—খুব সম্ভবত ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বকারীরূপে সাধারণের আস্থালাভের উদ্দেশ্যেই এ কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকবে, অথবা তারা নিজেরাই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকে ঐশীশক্তি জ্ঞান করে থাকবেন-এ যুগেও কবিত্ব শক্তিকে ঐশী দান মনে করা হয়—উক্ত আইন-কানুন সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঈশ্বরাধনার নির্দেশাবলী ব্যতীত বাকী সমস্ত বিধি বিধান তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থাধীনে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল সামাজিক জীবন যাপন করার পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সমাজের অর্থনৈতিক ও মানসিক উন্নতি অনুযায়ী সংশোধিত অসংশোধিতভাবে অথবা সংকুচিত কিংবা সম্প্রসারিতভাবে ঐসব আইন-কানুন অদ্যাবধি প্রচলিত। কাজেই হাম্মুরাবির এবং ইসরাইলী আইন-কানুন 'ইহজাগতিক প্রয়োজনে ইহজগতে ইহজগদ্বাসী মানুষ কর্তৃক প্রণীত বিশেষ কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রমাণ-রূপেই বিচার্য। নির্ধারিত আইন-কানুন অনুযায়ী সুশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন প্রণালীকে যদি ঐতিহাসিক কালের সভ্য সমাজ-ব্যবস্থার সূচনা বলা যুক্তিযুক্ত হয় তা'হলে নিঃসন্দেহে হাম্মুরাবী এবং ইসরাইলী রাজ রাজড়াগণকে (পয়গম্বর), তারা ঐশী প্রতিনিধিত্বে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহজাগতিক রাষ্ট্র স্থাপনকারীরূপে গণ্য করতে হবে। স্বীকার করতেই হবে যে, ব্যক্তির খেয়াল খুশিপ্রসূত যখন তখন পরিবর্তনীয় ফরমানানুযায়ী শাসিত দেশকে স্থায়ী রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়া যায় না। ঐগুলোকে জমিদারি বলা যায়। জমিদারিতে বাহুবলই সত্য। পক্ষান্তরে—পক্ষপাতমূলক হলেও রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রচলিত।

এখন প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং গ্রীসের উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। কৃষি ভিত্তিক ঐতিহাসিক-কালীন প্রাচীন ভারতবর্ষে আমরা চতুবর্ণীয় আর্থ সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা প্রচলিত দেখতে পাই। ব্রাহ্মণ সেখানে শ্রেষ্ঠতম বর্ণ। জ্ঞানার্জন, বেদমন্ত্রোচ্চারণ, রাজ-রাজড়াদিগকে মন্ত্রণাদান, রাজ পৌরোহিত্যগিরি এবং ঐ সকলের বিনিময়ে ভূমি, গোধন, সোনাদানা গ্রহণ ও আইন-কানুন প্রণয়নের অধিকার ব্রাহ্মণের। ক্ষত্রিয়ের কাজ রাজ্য শাসন, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং যাগযজ্ঞাদি করা। বৈশ্যের জন্যে কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নির্ধারিত। শূদ্ররা সেবক এবং তাদের জন্যে যাবতীয় হীনকার্য নির্দিষ্ট---তাদের বসবাসের জন্যে আলাদা স্থান বরাদ্দ। এ সমাজেও দেখা যায়, যাবতীয় আইন-কানুন ইহ-জগদ্বাসীদের ইহজাগতিক লক্ষ্যার্জনের জন্যে প্রণীত হয়েছে। মনুসংহিতাকে হিন্দুর আদি আইন-তথা-ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। আজকের বিচারে গ্রন্থটিতে বহু বাহুল্য বস্তু বিদ্যমান। কিন্তু গ্রন্থটিতে ব্রাহ্মণের ধর্ম, কর্তার দায়-দায়িত্ব ও তাঁর প্রতি কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিদের কর্তব্য, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি বিধান, বিবাহ, স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম, অপরাধীর দণ্ড, শূদ্রধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ আছে সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করলে একমাত্র এ-সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, ইহজগতে চতুর্বর্ণীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে দৃঢ় এবং চিরস্থায়ী করার বিশেষ উদ্দেশ্যেই মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল। ওসব বিধি বিধানের প্রতি জনগণের বিশেষতঃ নিম্নবর্ণীয় লোকদের অন্ধ আস্থা উদ্রেক করে সমাজকে স্থিতিশীল রাখার বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণ মনুসংহিতাকে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দান করেন। মোট কথা ইহজগদ্বাসী মানব সমাজের ইহ-জাগতিক প্রয়োজনেই মনুসংহিতা রচিত হয়। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রাদি পাঠ করলে তার মধ্যে ইহজাগতিক জীবনের এত আধিক্য পরিদৃষ্ট হয় যে, ওগুলোর পারলৌকিক আবশ্যকতা সম্বন্ধে রীতিমতো সন্দেহের উদ্রেক হয়। বর্ণশ্রেষ্ঠরা মন্ত্রতন্ত্র, জ্ঞানচর্চা প্রভৃতি উচ্চ মার্গীয় কাজকর্মে লিপ্ত আছেন ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ অতিমাত্রায় ভোজন বিলাসী, সোমরস (মদ্য) পায়ী এবং অনুদান গ্রহীতাও। পৌরোহিত্য কর্মের প্রাপ্যও নির্দিষ্ট। ঐশ্বর্যশালী হওয়ার এমন সুযোগও কখনও কখনও ব্রাহ্মণ পেয়েছিল যে, "ব্রাহ্মণ পত্নীরা যাতে মুক্তা, মরকত, মণি, রূপা, রত্ন এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কার্পাস বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ববীজ, এবং কুষ্মাণ্ডলতাপুষ্পের পার্থক্য চিনতে পারেন সেই জন্যে একদল নাগরিক রমণীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল" (অতীন্দ্র মজুমদার-চর্যাপদ, পৃ. ১৫)। আজকের সমাজেও চরম বিলাস ব্যসনে লিপ্ত এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বহু দ্রব্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকরাই সাধারণতঃ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে "দিন ভিক্ষা তনু রক্ষায়" লিপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সচ্চরিত্র এবং ধর্মনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশ খয়রাত করেন। আইন-শৃঙ্খলাও শেষোক্তদের উপর প্রযোজ্য। অপরদিকে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে নায়কত্ব করতেন, যোদ্ধার জীবিকাও গ্রহণ করতেন (প্রাগুক্ত)। শূদ্রের অধ্যাপনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূদ্রের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, চিকিৎসা প্রভৃতি কার্য নিষিদ্ধ হলেও প্রয়োজন বোধে ব্রাহ্মণ কৃষিকার্যও করতে পারতেন। ইংরেজী "Head I win, tail you loose" প্রবচনটি স্মরণীয়। অপরদিকে ব্রাহ্মণ মুনিঋষিগণকেও যাবতীয় মানবিক গুণে গুণান্বিত দেখা যায়। কামভাব উদ্রেক হলে বিবাহিতা অবিবাহিতা নির্বিশেষে যে কোনো যুবতীতে বীজ নিক্ষেপনের অধিকার ব্রাহ্মণ মুনিঋষিদের ছিল বলেই মনে হয়। এ ধরনের কাহিনী বিদ্যমান। তেমনি ব্রাহ্মণ রমণীও তাঁর কামভাব নিবারণ অথবা সন্তান প্রাপ্তির জন্যে যে কোনো বর্ণীয় পুরুষের সঙ্গে রমণে লিপ্ত হতে পারতেন। ইহজাগতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মিথ্যা বলতে কুন্ঠিত হন নি। প্রসঙ্গত জনৈক বৃদ্ধ ইসরাইলী মণ্ডলের বিষয় স্মরণীয়। তিনি পথিপার্শ্বে উপবিষ্টা অবগুন্ঠিতা পুত্রবধূকে দেবদাসী অর্থাৎ বারবণিতাজ্ঞানে দিনে দুপুরে ঐখানেই তার সঙ্গে রমণকার্য নিষ্পন্ন করেন। দেবদাসী প্রথা প্রাচীন ভারতবর্ষেও বিদ্যমান ছিল। তারা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর ভোগ্যা। মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাও সম্ভবতঃ তাদের সঙ্গে সহবাস করতেন। স্মরণীয় যে কৌমার্য রক্ষাকারী রোমান ক্যাথলিক ধর্ম যাজকগণও (পোপ সহ) কুমারী নানদের সঙ্গে জৈবধর্ম পালনে লিপ্ত হতেন। যাজকদের জারজ সন্তানের সাক্ষাৎ আমরা বই পুস্তকে পাই। এ সব প্রথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরুদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না। হিন্দু শাস্ত্রের পূজ্যরাও দেবদেবীতে বিভক্ত। তারা স্বামী স্ত্রীও। সন্তানও উৎপাদন করেন। ব্যভিচারেও লিপ্ত হন। হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া, প্রেম, বাৎসল্য, রিরংসা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানবিক গুণাবলীতে তারা গুণান্বিত। তাদের মধ্যে প্রভুত্বের জন্যে যুদ্ধও হয়। আসমানী কেতাবরূপে পরিগণিত বেদেও তাণ্ডবের বিবরণ আছে। Max weber বলেছেন, "In individual instances residues of ancient orgiasticism are to be found in the vedas. Indra's drunkennes and dance, and the sword dance of the maruts (corybanties) stem from the intoxications and ecstasy of heroes. Moreover, it is obvious that the great priestly Soma-sacrifice was originally a cult-tempered intoxication orgy. The much discussed dialogues of the Rigveda are presumably the slender residues of cult drama," (Religion of India-Free Press Paperback-p. 137).

মোট কথা সমস্ত প্রাচীন ধর্মমতে দেবলোক ইহলোকেরই সংস্করণ—উন্নত সংস্করণ বলবো কিনা ঠিক বলতে পারছি না। প্রাচীন বহু-ঈশ্বরবাদী এবং সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম পরবর্তীকালে উন্নতিলাভ করে একেশ্বরবাদে উন্নীত হওয়ার পরেও স্বর্গের অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পুনরুত্থান পর্বে বিচার আচার, দণ্ড ও পুরস্কারদান প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির উল্লেখ আছে। ওগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহজগৎকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মোট কথা, ইহজাগতিকতা দ্বারা প্রাচীন দেবলোক এবং পরবর্তীকালীন স্বর্গনরক নিয়ন্ত্রিত। অপরদিকে সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বর ঈশ্বরী এবং মুনিঋষিগণের কাছে ইহজাগতিক নানা অভিলাষ পূরণে সহায়তা করার জন্যে বর প্রার্থনা করে। তারা বর দিয়েও থাকেন। শাপ দিলে ক্ষতি হয় ইহলোকে। প্রথাটি কিঞ্চিৎ সংশোধিতভাবে এখনও বিদ্যমান। পুত্রার্থে, রোগ নিরাময়ার্থে, মামলা মোকদ্দমায় জয়ী হওয়ার জন্যে, চাকুরি ও ব্যবসায়ে উন্নতির জন্যে, চোরাকারবারি মুনাফাখোরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে মুক্তির জন্যে এবং প্রেমে সাফল্যলাভার্থে মসজিদ মন্দিরে মানত, গুরু ও পীরের দ্বারে ধর্ণা দেয়া, বলি বা সদকাদান প্রভৃতি সেই প্রাচীন প্রথার আধুনিক রূপ এবং নিতান্তই ইহজাগতিক ব্যাপার।

হিন্দুর প্রাচীনতম রাজনৈতিক গ্রন্থ সম্ভবতঃ কৌটিল্যের (চাণক্য) অর্থশাস্ত্র। গ্রন্থটি এত বেশী ইহজাগতিক যে ওটি পাঠ করলে মনে হয় আমরা যেন প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পরে রচিত আবু আলী আল হাসান তুসী (নিজামুল মুলক পদবীতে সমধিক পরিচিত) রচিত সিয়াসতনামা এবং আঠার শত বৎসর পরে মেকিয়াভেলী রচিত দ্য প্রিন্স পাঠ করছি। কৌটিল্য ব্রাহ্মণ এবং সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক। ঐ সময়ে ভারতবর্ষে প্রবল পারলৌকিকভাব (ধর্মভাব) বিদ্যমান থাকার কথা। অথচ কৌটিল্য চোরকে চুরি করার এবং সাউধকে সজাগ থাকার—এমন কি রাজাকে গুপ্ত হত্যা এবং ডাকাতি করার পরামর্শও দিয়েছেন। এই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার বর্মধারী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তৎকালীন রূপ।

অপরদিকে ইহজগতে শিব ও বিষ্ণু নামক দেবতাদ্বয়ের প্রয়োগও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পঞ্চ-মকারের (মদ, মাংস, মাৎসর্য, মুদ্রা, মৈথুন) উল্লেখ হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। ভৈরবকে বশীভূত করতে পারলে জাদু বিদ্যায় সাফল্যলাভ নিশ্চিত। ভৈরবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে স্ত্রীশক্তি। লক্ষী, পার্বতী, দুর্গা, কালী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ঐ স্ত্রীশক্তি পরিচিত। তান্ত্রিক সাধুগণ পুং ও স্ত্রীশক্তির যৌন মিলনকে ধর্মকর্ম মনে করে থাকবেন। রুদ্রশিব এবং বিষ্ণু উভয়েই উৎপাদন বৃদ্ধির দেবতা। একজনের সঙ্গে স্ত্রীশক্তিরূপে আছেন পার্বতী। অন্য জনের সঙ্গে লক্ষী। ব্রহ্মা ত্রয়ী শক্তির তৃতীয় ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে আছেন সরস্বতী।

ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন লিঙ্গ পূজার যৌন মদমত্ততার দিকটি গোপন রাখতে চেষ্টা করেন। ওটার উপরে Sublimity বা এক অতীন্দ্রিয় নান্দনিকতার প্রলেপ লাগান। কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে পারেননি। "In truth, of course

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

though not recognised by orthodoxy, blood alcohol and sexual orgies remained the domain of actual folkcult of Siva" (Max weber-Ibid-p. 306). শৈবধর্মের এই ছিল ইহজাগতিকরূপ। স্বর্গেও শিব অধিক সচ্চরিত্র নন। এখন ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ধর্মের পরিণতি লক্ষ্য করা যাক।

বিষ্ণু হচ্ছেন প্রাচীন সূর্যদেব—উৎপাদন দেবতা। তার পূজাতে বলিদানের বিধান নেই। কিন্তু মৈথুন জীব জন্মদানের একমাত্র উপায়। বিষ্ণু পূজায় তাই হতো। "The orgiastic, and indeed sexual orgiastic origin of Bhakti ecstasy, is clear beyond all doubt, for the sexual orgies of the Krishna worshippers persisted even after the Brahmmanical sublimation of the God-contemplating devotion, remaining until the present". একশ্রেণীর চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবের কাছে "Bhakti was recognised to be the coarse sexual orgiasticism of the masses, accompanying cultivation of earth, and thereby was itself of a sexual orgiastic character." (Ibid).

কৃষ্ণের অপর নাম গোবিন্দ। রাখাল গোবিন্দ যৌবনে গোপী যুবতীদের সঙ্গে যে লীলায় লিপ্ত হতেন তার কাব্যিক বর্ণনা গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে। এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক কল্যাণ সাধনার্থে সৃষ্ট পদ্ধতিটি ধর্ম নামে অভিহিত হলেও স্বর্গ এবং নিসর্গ উভয় স্থান বিষয়েই ভারতবর্ষীয় চিন্তা স্থূল ইহজাগতিকতার দুর্লঙ্ঘ্যবৃত্ত অতিক্রম করতে পারেনি।

পরবর্তীকালে সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ স্থূলতার উপর উচ্চ মার্গীয় চিন্তার পোশাক পরিয়েছেন। এই পোশাকীরূপ দর্শন নামে পরিচিত। নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হিন্দু দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা এ নিবন্ধের জন্যে অনাবশ্যক। সংক্ষেপে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইহজাগতিক কল্যাণলাভের পন্থারূপে উদ্ভূত বহু-ঈশ্বরবাদী, সর্বেশ্বরবাদী এবং একেশ্বরবাদী বিশ্বাসকে উচ্চশিক্ষিত লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে চলছিল বলে মনে হয়। এই বিচার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসার ফল কতিপয় দার্শনিক পদ্ধতি। একটি শাখার মতে সত্তা অথবা সত্য এক ও অভিন্ন অর্থাৎ অবিভাজ্য। পরিদৃশ্যমান জগৎ সতত বিলীয়মান বিধায় তা মায়া (illusion) মাত্র। অষ্টম নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্যে এসে এ-মত চূড়ান্ত উন্নতি লাভ করে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী মতানুযায়ী পরম সত্তা নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্কাম, নির্বিকার, আদি অন্তহীন ইত্যাদি। সেই পরম সত্তার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়াই সকল দৃশ্য-জগতের নিয়তি। এ মতানুযায়ী কর্তা ও কর্ম, পূজ্য এবং পূজারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গীতায়ও এ মত ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীর জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ জ্ঞানলাভটাই যথেষ্ট---কোনরূপ আরাধনার আবশ্যকতা নেই। মানব জাতিকে নিয়তির দাস করার জন্যে এ মত যেমন অত্যন্ত অনুকূল তেমনি নীতিজ্ঞানহীন চরম দুর্বৃত্তের সমাজে পরিণত করার জন্যেও সমান অনুকূল। মনসুর হাল্লাস পন্থী মুসলিম সুফীরাও কতকটা এমতে বিশ্বাসী। ব্যাখ্যা করে বলার সম্ভবতঃ আবশ্যকতা নেই যে, নির্গুণ, নির্বিকার পরম সত্তা (ব্রহ্ম) থাকা না থাকা সমান। সুতরাং এটা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের নিরীশ্বরবাদ। কিন্তু শঙ্কর সাধারণ লোকের জন্যে তাঁর চরম অদ্বৈতবাদী ধর্ম নিষিদ্ধ করেছেন। সাধারণ লোক চতুর্বর্ণীয় ধর্ম পালন এবং দেবদেবীর মূর্তি পূজা করবে। সুতরাং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শঙ্করের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য যাই হোক, তাঁর অদ্বৈতবাদী দর্শন (ধর্ম) প্রকৃতপক্ষে ইহজগদ্বাসী সাধারণ মানুষকে আফিংখোরদের মতো বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত করে তাদের উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্ব দৃঢ় করার অনুকূলে কাজ করেছে। শঙ্করাচার্যের বৌদ্ধধর্ম বিরোধী এবং পরশুরামের ক্ষত্রিয় বিরোধী অভিযান তার প্রমাণ। সুতরাং অদ্বৈতবাদী দর্শন (ধর্ম) শ্রেণী বিশেষের ইহজাগতিক কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের সহায়ক হয়েছে।

হিন্দু দর্শনে দ্বৈতবাদী (প্রকৃতি ও পুরুষের সমন্বয়ে জগৎ) এবং অণুবাদী শাখাও বিদ্যমান। বহু ঈশ্বরের স্থানে গুণান্বিত এক ঈশ্বরের কল্পনাও করা হয়েছে। প্রকৃতি ও পুরুষ সমন্বিত দ্বৈত অস্তিত্বে বিশ্বাসীগণ পুরুষের ক্ষমতা অত্যন্ত খর্ব করে দিয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে অথর্ব। সুতরাং বলা যায়, এ-মতে ইহজগৎ প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রীচৈতন্যকেও একেশ্বরবাদী বলা হয়। তাঁর মতে বিষ্ণু একা পরমেশ্বর। তাঁর ভক্তিবাদী ধর্মের ব্যবহারিক রূপের উল্লেখ আগেই করেছি। অনেকের কাছে হয়তো শিবই পরমেশ্বর, কিংবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মিলে ক্রীশ্চান ট্রিনিটির ন্যায় তিনে এক। কিন্তু এগুলোর ব্যবহারিক রূপও বৈষ্ণব ধর্মের মতো হয়েছে। সুতরাং একেশ্বরবাদী বিশ্বাসও প্রকৃতপক্ষে ইহজগতে সাধারণ লোকের উপর নতুন গুরু শ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপনে সহায়তা এবং সে শ্রেণীটির ভোগ বিলাস নিশ্চিত করেছে। সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক হিন্দুর একেশ্বরবাদী মতও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত, ভোগী এবং নিয়তিবাদী করেছে। হিন্দুদর্শনের বৈশেষিক শাখাটিকে অণুবাদী বলা হয়। সম্ভবতঃ নাস্তিক গণ্য হয়ে সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় কনদ ঈশ্বরের প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে চর্মচক্ষে অদৃশ্য অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু হচ্ছে মৌলিক এবং আসল অস্তিত্ব। পরমাণু আদি অন্তহীন শাশ্বত সত্তা। কিন্তু এককভাবে তারা শাশ্বত হলেও যুক্তভাবে তারা নশ্বর। অর্থাৎ বহু পরমাণুর সমন্বয়ে মানবদেহ গঠিত। কনদ আত্মার বদলে অণুর সংযোজনে জীবন সৃষ্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনা করেছেন। তাঁকে ভারতবর্ষের অন্যতম লোকায়ত দার্শনিক বলা যায়। পরমাণুর সংমিশ্রণে মানবদেহ তৈরী হলে বর্ণবৈষম্য লোপ পায়, সৃষ্টির পশ্চাতে ঐশ্বরিক ক্রিয়া চিন্তা করার আবশ্যকতাও থাকে না। সম্ভবতঃ নির্ভেজাল দর্শন বিধায় ধর্মমতরূপে বৈশেষিক মত জনগণের মধ্যে বিস্তৃতিলাভে ব্যর্থ হয়।

ষড়দর্শন বহির্ভূত চিন্তা ভাবনাও ভারতবর্ষে হয়েছে। এ চিন্তায় জীবাত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি কোনো আত্মার স্থান নেই। প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ প্রমাণ (দর্শন, স্পর্শ) ব্যতীত অন্য কোনোরূপ প্রমাণ গ্রহণ করতে তারা রাজী নয়। বেদও প্রমাণ হিসেবে অগ্রাহ্য। এ শাখাটিকে নাস্তিক্য অথবা চার্বাকী দর্শন নাম দিয়েছেন আস্তিক্যবাদীগণ। চার্বাক নাকি ছিলেন রাক্ষস জাতিভুক্ত, সম্ভবতঃ অনার্য। রাক্ষস জাতিকে ধ্বংস করার বিশেষ উদ্দেশ্যেই নাকি ভগবান বৃহস্পতি চার্বাককে লোকায়ত দর্শন শিক্ষা দেন। বৃহস্পতি ভগবান হয়েও এখানে কৌটিল্য মেকিয়াভেলির ভূমিকায় অবতীর্ণ, সুতরাং জগদ্বাসী দুশ্চরিত্র মানবের স্বভাব তার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। লোকায়ত দর্শনে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি এবং বায়ু এই চারটি মূল বস্তু। চৈতন্যের সঞ্চার সম্বন্ধে এ দর্শনে বিশ্বাসীদের মত হলো, আলাদাভাবে একটি বস্তুর মধ্যে উত্তেজক শক্তি না থাকলেও কয়েকটি বস্তুর সংমিশ্রণে যেমন উত্তেজক শক্তির সৃষ্টি হয় তেমনি মূল চারটি বস্তুর সংমিশ্রণে গঠিত দেহ হতে আপনা আপনি চৈতন্য বা আত্মার সৃষ্টি হয়। চার্বাকীয় লোকায়ত দর্শন সূত্র সমূহের ম্যাক্সমুলারকৃত ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

"There are four elements, earth, water, fire and air, And from these four elements alone is intelligence produced, just like the intoxicatiing power from Kinwa etc mixed together ; since in 'I am fat', 'I am lean', these attributes abide in the same subject, And since fatness etc resides only in the body, it alone is the soul and no other. And such phrases as 'my body' are only significant metaphorically." সুতরাং লোকায়ত দর্শনানুযায়ী দেহ লয় প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও লয় ঘটে : পরকাল, পুনর্জন্ম প্রভৃতির অস্তিত্ব নেই। অতএব ইহজাগতিক সুখভোগই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যন্ত্রণা এবং আনন্দ অবিচ্ছেদ্য।

"The pleasure which arises to men from contact with sensible objects, is to be relinquished as accompanied by pain such is the warning of fools. The berries of paddy, rich with the finest white grains, what man, seeking his true interst would fling them away,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

because covered, with husks and cest ? ভগবান বৃহস্পতি নিজেই শিক্ষা দিচ্ছেন :

"Fire is hot, water cold, and the air feels cool ; By whom was this variety made ? (we do not know), therefore it must have come from their own nature. There is no paradise, no deliverance and certainly no self in another world. Nor are the acts of the Asramas or the casts, productive of rewards. The Agnihotra, the three vedas, the three staves (carried by ascetics)-[ত্রিশুল] and smearing oneself with ashes, they are the mode of life made by their creator [ধাত্রী] for those who are devoid of sense and manliness. If a victim slain at the Gyotishtoma will go to heaven, why is not his own father killed by the sacrificer ? If the Sraddha-offering gives pleasure to beings that are dead, then to give a viacticum to people who travel here on earth, would be useless. If those who are in heaven derive pleasure from offerings, then why not give food here to people while they are standing on the roof ? As long as he lives let a man live happily ; after borrowing money let him drink ghee. How can there be a return of the body after it has once been reduced to ashes ? If he who has left the body goes to another world, why does he not come back again perturbed by love of relations ? Therefore funeral ceremonies for the dead were ordered by the Brahmans, as a means of livelihood, nothing else is known anywhere. The three makers of Vedas were buffoons, knaves, and demons. The speech of the pundits is like Garphari-Tarpharl, (unintelligible). The obscene act there (at the horse sacrifice) to be performed by the queen has been proclaimed by knaves, and likewise other things to be taken in hand. The eating of flesh was likewise ordered by demons,"

নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শ্লেষাত্মক কটূক্তি। মনে হয় ব্রহ্মার বিশেষ অনুগৃহীত ব্রাহ্মণদের কথা এবং কাজের মধ্যে সংগতির গুরুতর অভাব দেখে কোনো স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী ব্যক্তি এই আপাতঃদৃষ্টিতে নৈরাজ্যবাদী মতামত প্রচার করে থাকবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে চার্বাককে রাক্ষস বলা হলেও তার মত লোকায়ত দর্শনরূপে খ্যাতিলাভ করেছে। লোক শব্দটি ভুবন এবং সাধারণ মানুষ এই দুই অর্থে ব্যবহৃত। যে অর্থেই ব্যবহৃত হোক, নির্বাচিত নাম প্রমাণ করে যে, আপাতঃদৃষ্টিতে স্থূল জড়বাদী মনে হলেও, লোকায়ত দর্শন সম্ভবতঃ ছিল ব্রাহ্মণ্য ভণ্ডামি মোনাফেকির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপক প্রসার লাভ না করলে লোকায়ত নাম হতো না। ম্যাক্সমুলার মন্তব্য করছেন, "As viewed from a Brahmanic point of view, and we have no other, the opposition represented by Brihaspati and others may seem insignificant, but the very name given to these heretics would seem to imply that their doctrines had met a world-wide acceptance." গভীর ভাবে বিচার করলে গীতায় প্রচারিত মতামতের সঙ্গে চার্বাকীয় দর্শনের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন।

বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদী মত লোকায়ত দর্শন-পূর্ববর্তী না পরবর্তী সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, উভয় মত পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্মফল ও জন্মান্তর স্বীকার করে নিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে আপস করেছেন, কিন্তু তাঁর শেষ কথা ইহলোকে নির্বাণ---পরলোকে স্বর্গ-নরক নয়। সুতরাং প্রাণী জগতের অনাবশ্যকতার পরিপোষক হওয়া সত্ত্বেও (বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কৌমার্য তার প্রমাণ) বৌদ্ধমত প্রকৃতপক্ষে সবল জীবনবাদহীন ইহজাগতিকতা।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয় জীবনবোধ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার পূর্বে সামান্য কিছু মন্তব্য রাখছি। হিন্দু সমাজ জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গে জীবনকে ভাগ করে যার যেটা খুশী বেছে নিতে পারে। জ্ঞানমার্গে সিদ্ধজনেরা সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা হতে মুক্ত। সুতরাং কার্যতঃ তাদের জন্যে সব কিছু হালাল এবং আগেই বলেছি ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ তার সে-অধিকার ভোগ করার ব্যাপারে কখনও কার্পণ্য করতেন না। মদ, মৈথুন, মাংস, ঘৃত, অর্থবিত্ত, খুনখারাবি প্রভৃতি সব কিছুর প্রতি ব্রাহ্মণের সমান আগ্রহ ও পক্ষপাতিত্ব ছিল এবং এখনও আছে। ভারতবর্ষে এখনও ব্রাহ্মণের আধিপত্য বিদ্যমান। পৃথিবীতে লভ্য সর্বপ্রকার সুখসুবিধা তারা ভোগ করছেন। কর্মমার্গীয়েরা সুগম্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন এবং যাবতীয় পার্থিব সুখসুবিধা ভোগ করতেন। দেবতাকে সন্তুষ্ট করে ধনলাভ তাদের লক্ষ্য। ভক্তিমার্গীয়েরা কি করতেন না করতেন এবং এখনও করেন তার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। অপরদিকে হিন্দুর পুনর্জন্মবাদও প্রকৃতপক্ষে ইহজাগতিকতা। কেননা চূড়ান্ত স্বর্গ প্রাপ্তি ইহলোকে কৃতকর্মের উপর নির্ভরশীল।

মোট কথা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ জীবনের ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, তথাকথিত ভারতীয় স্পিরিচুয়ালিজম (উচ্চ মার্গীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা) প্রকৃতপক্ষে চতুর্বর্ণীয় অসম সমাজ ব্যবস্থা কায়েম রাখার পক্ষেই কাজ করেছে। রামায়ণ মহাভারতোল্লিখিত যুদ্ধ হতে শুরু করে ঐতিহাসিক কালেও অগণিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে ভারতবর্ষীয়েরা। বৌদ্ধমতাবলম্বীরাও নরহত্যা করতে ইতস্ততঃ করেনি, এখনও করছে না। আজকের দিনেও অচ্ছ্যুতরূপে পরিচিত মানুষ পুড়িয়ে মারেন উচ্চবর্ণীয়েরা। শ্রেণী আধিপত্য অব্যাহত রাখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে স্পিরিচুয়ালিজম, সিকিউলারিজম, ডেমোক্র্যাসি, থিওক্র্যাসি, অলিগার্কি, এবং মনার্কির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আগেও ছিল না এখনও নেই।

বিশ্বের সকল দেশের মানবেতিহাস পর্যালোচনা প্রথমতঃ অত্যন্ত দুরূহ কাজ, দ্বিতীয়তঃ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে তা সম্ভব নয়। কিন্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিধায় গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের ন্যায় প্যাগান গ্রীসেও একেশ্বরবাদী, বহু-ঈশ্বরবাদী, নাস্তিক্যবাদী, অণুবাদী প্রভৃতি ধর্মীয় এবং দার্শনিক চিন্তাভাবনা উদ্ভূত হয়েছিল। প্রকৃত কথা বলতে কি, আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের সমস্ত শাখা প্রশাখাকে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের টিকা ভাষ্য এবং সংস্কৃত রূপ বললে খুব অন্যায় করা হয় না। কিন্তু একটি বিষয়ে প্যাগান আমলীয় মনীষীদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে জগতের অন্যান্য অঞ্চলের সমকালীন চিন্তা-ভাবনার গুণগত এবং মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবাসী চাণক্য রাজনীতি রচনা করেছেন বটে কিন্তু তার মধ্যে রাষ্ট্র চিন্তা অর্থাৎ রাষ্ট্রের আর্থ সামাজিক ভিত্তি সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা নেই। বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো মজবুত করার পথ নির্দেশ আছে কিন্তু রাজনৈতিক দর্শন নেই। হিন্দুর চতুর্বর্ণীয় সমাজ ব্যবস্থায় সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণ চিন্তা থাকার প্রশ্ন ওঠে না। ভারতবর্ষীয়েরা চতুর্বর্ণীয় সমাজ ব্যবস্থা উদ্ভাবনে অতুলনীয় দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্য ভিন্ন ঐ সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পশ্চাতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

প্যাগান গ্রীস রাজনৈতিক দর্শনের জন্মদাতা। সীমিত ক্ষেত্র এবং পরিসরে হলেও গ্রীক মনীষীগণ মানব কল্যাণকে লক্ষ্যরূপে ধরে নিয়ে রাষ্ট্রচিন্তা করেছেন। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালে প্রোটাগোরাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, "Man is the measure of all things" এবং "thought is the relation of the thinking subject to the object thought of, and that the thinking subject, the soul, is nothing more than the sum of different moments of thinking". দেবদেবীগণ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হচ্ছে : "I cannot feel sure either that they are like in figure for there are many things that hinder sure knowledge, the obscurity of the subject and the shortness of human life."

অপরদিকে রোমানদের natural lawর ধারণাও গ্রীক স্টয়িক-দর্শন হতে প্রাপ্ত। আমার মতে, প্রকৃত ইহজাগতিকতা অর্থাৎ পরলোককে ইহলোক হতে পৃথক করে দেখার চিন্তাভাবনা প্রোটাগোরাস হতেই শুরু হয়। দু'হাজার বৎসর পরে রেনে দেকার্তে "I think therefore I am" বলে অন্যভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রোটাগোরাসের কথাই বলেছিলেন। উল্লেখ্য যে, চিন্তা করি বলেই আমি আছি যেমন ঠিক তেমনি আছি বলেই চিন্তা করিও ঠিক। দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করলে চিন্তার জন্যে অতীন্দ্রিয় বায়বীয় অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

প্যাগান গ্রীক এবং তার উত্তরাধিকারী রোমানদের রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য সম্বন্ধে ভাবলে এখনও বিস্ময়বোধ হয়। প্লাটো এবং এ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক সামাজিক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সুধীজন পরিচিত বলেই তারা সুধীজন। ওরা উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ব্যক্তি। আমি শুধু এই সামান্য মন্তব্যটুকু যোগ করতে চাই যে, প্লাটো এবং এ্যারিস্টটল উভয়েই ধর্মকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন—ওদের উভয়ের কাছে ধর্ম state enterprise অর্থাৎ রাষ্ট্রের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একটি। এ্যারিস্টটল ধর্মবিভাগ দেখা শোনার জন্যে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়মিত বেতনভুক অফিসার নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। প্লাটো ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক জীবন প্রথা বিলোপের পক্ষে। অবশ্য তিনি রাষ্ট্রকে পরম সত্যরূপে কল্পনা করেছেন, তার কল্পনার সঙ্গে পরবর্তীকালীন হেগেলীয় রাষ্ট্র চিন্তার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক জীবন বিলোপের সুপারিশ করে তিনি মার্কসীয় কম্যুনিজম এবং কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের বীজও রোপণ করে যান। এ্যারিস্টটলের মতে মানবজাতির সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্যেই রাষ্ট্রের আবশ্যকতা। সবদিক আলোচনার পর এ্যারিস্টটল এ-সিদ্ধান্তেই পৌঁছান যে, সার্বভৌমত্ব জনগণের এবং অধিকাংশ লোকের (দাস বাদে কেননা গ্রীক দার্শনিকদের মতে দাসেরা মানুষ নয় সজীব যন্ত্র) মঙ্গল সাধনে বিধিবদ্ধ আইন কানুনানুযায়ী শাসিত রাষ্ট্রই সর্বোত্তম। এ্যারিস্টটলই সম্ভবতঃ প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি যিনি অন্যান্য কারণের মধ্যে শ্রেণীর উপর শ্রেণীর নিপীড়নকেও রাজনৈতিক সামাজিক বিপ্লবের কারণরূপে নির্দেশ করেছেন। অপরদিকে গুণগত বিচার বিশ্লেষণ বাদ দিলে ড্রাকো সলোন প্রমুখ ইহজগতে বসেই আইন প্রণয়ন করেছিলেন, ঈশ্বরের নিকট হতে তারা আইনের বই পেয়েছিলেন বলে কোথাও উল্লেখ দেখিনি। রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, বণিকতন্ত্র, অলিগার্কি, টিরানী, ডিক্টেটরশিপ প্রভৃতি ধরনের রাষ্ট্র সম্বন্ধে গ্রীকরাই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা-ভাবনা করেন। নামগুলোও তাঁদের দেয়া। ধর্মতন্ত্র বা থিওক্র্যাসির উল্লেখ প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তায় আছে বলে মনে পড়ছে না। সলোনই সম্ভবতঃ প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি যিনি আইন প্রণয়ন করে ঋণের দায়ে ক্রীতদাসে পরিণত ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করেন এবং দেহ বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ প্রথা বন্ধ করে দেন। তিনি গরীব নাগরিকদের জন্যে পরিষদের (Ecclesia) দ্বার খুলে দেন এবং তাদেরকে ভোটাধিকারও দেন। শেকসপীয়রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাইলক চরিত্র সলোনের কাল এবং শেকসপীয়রের উপর তাঁর প্রভাব স্মরণ করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে কিছুকাল পূর্বেও ঋণের দায়ে সিভিল জেলে আটক রাখার প্রথা এ দেশে বিদ্যমান ছিল—এখনও আছে কিনা জানি না। সম্পত্তিহীন গরীব লোককে এ দেশে ভোটাধিকার দেয়া হয় মাত্র কিছুকাল পূর্বে—আমাদেরই জীবৎকালে। ঋণ সালিশি বোর্ড এবং সুদের হার ও তার সীমা নির্ধারণ সূচক আইনও এ দেশে আমাদের জীবৎকালেই প্রণীত এবং জারি হয়।

পরবর্তীকালে রোমান সিসেরো (Cicero) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেন, "The affair of the people". তার মতে "The commonwealth, then, is the people's affair, and the people is not every group of people associated in any manner but is the coming together of a considerable number of men who are united by a common agreement about law and by the desire to participate in mutual advantages. তাঁর এ উক্তি বহুকাল পরে রচিত রুশোর Social Contract গ্রন্থটি স্মরণ করিয়ে দেয় না কি? এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করতে চাই না। আগেই বলেছি এ সব বিষয় সুধীজন জ্ঞাত আছেন। শুধু একটি তাৎর্যপূর্ণ দিকের প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গণতান্ত্রিক শাসনামলেও গ্রীস এবং রোমে প্যাগান ধর্ম ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্যে ধর্মের অর্থাৎ ঐশ্বরিক মঞ্জুরী দাবী করা হতো না। ঐ সময়ে ধর্ম ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র ছিল মানব প্রতিভা প্রসূত ইহজাগতিক প্রতিষ্ঠান—ইহজগদ্বাসী মানুষের কল্যাণার্থে ইহজাগতিক আইন কানুন ও নীতিমালার অধীন। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল ধর্ম। গণতন্ত্রের বদলে গ্রীস ও রোমে টায়রেন্ট এবং রাজা বাদশার শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে শাসক ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব অথবা মঞ্জুরী দাবী করেছেন। টায়রেন্ট Pisistratus এথেন্স দখল করার সঙ্গে সঙ্গে দেব-দেবীদের সম্মানে নতুন অনুষ্ঠান উৎসবের আয়োজন এবং মন্দির নির্মাণ করেন। নিঃসন্দেহে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই ওসব কাজ করা হয়েছিল। স্মরণীয় যে, প্রাচীন মিশর, ভারতবর্ষ, বেবিলন, জাপান প্রভৃতি দেশের রাজাবাদশারা হয় ঈশ্বরসূত অথবা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত বলে দাবী করতেন। বৃটেনের রাজা এখনও King by the Grace of God। ইসলাম ধর্মানুযায়ী মানবজাতি যৌথভাবে আল্লাহর খলিফা। তদনুযায়ী শাসনকর্তা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ এককভাবে আল্লাহর খলিফাত্ব করতেন। এখনও কোনো কোনো মুসলিম প্রধান দেশের শাসক তাই করছেন। সম্ভবতঃ এই বেআইনী ও অযৌক্তিক প্রথাকে সিদ্ধ করার জন্যেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ইসলামী নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্রাহ্য করে "রোজ আজল" থিওরী অর্থাৎ গ্রীক এবং গীতার নিয়তিবাদের শরণ নিয়ে অনগ্রসর নিরক্ষর মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার সজ্ঞান চেষ্টা কোনো কোনো দেশে হচ্ছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গ পরে আবার আসবে। যা বলছিলাম।

উদ্ভবকালে খৃষ্টধর্ম বরং রাষ্ট্র এবং ধর্মকে পৃথকভাবেই দেখেছে। যিশুখৃষ্ট নিজেই বলেছেন, "Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's and unto God the things that are God's."

(Mathew, xxii, 21)

ঐ সময়ে রোমান রাষ্ট্রীয় দর্শনে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণেরই--শাসকের ক্ষমতার উৎস জনগণ। কিন্তু খৃষ্টের মৃত্যুর পরে, তখন সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্ম অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হয়ে থাকবে, সেন্ট পল যিশুর উক্তি অগ্রাহ্য করেন। তিনি ইসরাইলী ধর্মগ্রন্থসমূহে ব্যক্ত ব্যৈক্তিক ঈশ্বরবাদী মত গ্রহণ করে বলেন, সকল ক্ষমতার মালিক মোক্তার ঈশ্বর, সুতরাং ইহজাগতিক ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা নেই। উল্লেখ্য যে, ইয়াহুদী রাজা বাদশাহগণ নিজদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি জ্ঞান করতেন : অর্থাৎ ওদের ক্ষমতার উৎস ঈশ্বর, শাসিত রাজ্যের মানুষ নয়। গণতন্ত্রের স্থলে রোমে রাজতন্ত্র স্থাপিত এবং বহু জাতি ও ধর্মভুক্ত লোক রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে আসার পর তৎপূর্ববর্তী মেসিডোনীয় আলেকজান্দার এবং এশীয় সম্রাটদের অনুকরণে রোমান সম্রাটগণও ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে থাকেন। সিজারকে খোদা জ্ঞান করতে অনুপ্রাণিত করা হতো লোকজনকে। মিশরীয় ফারাওরাও খোদাত্ব দাবী করতেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম অন্য পথ ধরলো। ইতালি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর খৃষ্টান পুরোহিত সম্প্রদায় ধর্মের নামে রাষ্ট্রকে তাদের শাসনাধীনে আনতে চাইলেন। হলি রোমান এম্প্যায়ার, ক্যাথলিক পোপের সর্বাত্মক আধিপত্য—তার চার্চ সাম্রাজ্য, মধ্যযুগীয় থিওক্র্যাসি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা ও সাধকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্মীয় বর্বরতার ইতিহাস সুধীজন জ্ঞাত। দীর্ঘকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকার পর রেনেসাঁ আন্দোলন ক্রমে ক্রমে ইয়োরোপকে পুনরুজ্জীবন দান করে। ঐ আন্দোলনের পাশাপাশি বণিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ, সামুদ্রিক অভিযান ও তার ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ—বিশেষ করে নবোত্থিত সারাসীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পুনঃ সংযোগ এবং অপরদিকে মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের সামন্ত রাজাগণের বিদ্রোহ—উভয় মিলে ক্রমে ক্রমে ইয়োরোপকে বর্বর থিওক্র্যাটিক শাসনের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করতে থাকে। লুথার, কেলভিন এবং উটরেক্টের যাজক সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের ফলেও পোপের একচ্ছত্রাধিপত্য ভেঙ্গে যায়। শেষোক্ত ধর্মীয় বিদ্রোহসমূহকে আমাদের দেশের ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা যায়। অবিমিশ্র খাঁটি ধর্ম পুনঃ প্রবর্তন করে পৃথিবীকে ঈশ্বরের রাজ্যে পরিণত করার আন্দোলন হলেও ওয়াহাবী আন্দোলনের ন্যায় উল্লিখিত ইয়োরোপীয় ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ গরীব চাষী মজুর এবং নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্বনিম্ন ইহজাগতিক অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। পোপের একচ্ছত্রাধিপত্য অবসানের মূলে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ভূমিকা রয়েছে। কতকটা আদিম কম্যুনিজমের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার ফলে ওয়াহাবী বিদ্রোহ যেমন বাংলায় সংগ্রামী কৃষক প্রজা আন্দোলনের জন্মদান করে তেমনি প্রোটেস্টান্ট বিদ্রোহ ইয়োরোপে বুর্জোয়া জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাপক গণআন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। রেনেসাঁ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার আন্দোলন। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগে বাধা অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা যন্ত্রপাতি আবিস্কৃত হতে থাকে : স্থাপিত হতে থাকে কলকারখানা এবং সেগুলোতে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যেতে থাকে : জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র রচনা শুরু হয়। প্রকৃত ইহজাগতিক জাতিক রাষ্ট্র গঠনের থিওরি পুনরায় নতুন বোতলে উপস্থিত করেন রুশো এবং অন্যান্য মনীষীগণ। তার আগেই দেকার্তে মানুষকে প্রাধান্য দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, আমি চিন্তা করি বলেই আমি আছি। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিস্তৃতির ফলে ইউরোপের সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বদলে যেতে থাকলে খৃস্টধর্ম বাস্তব বাধ্যবাধকতার চাপে পুনরায় যিশু খৃস্টের উপদেশ—পৃথিবীর শাসককে তাঁর প্রাপ্য এবং পরলোকের শাসক ঈশ্বরকে তার প্রাপ্য দেয়ার নীতিতে ফিরে যায়। এখনও খৃস্ট ধর্ম ঐ স্থানেই আছে। রোমান ক্যাথলিক পোপ আছেন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের ইহজাগতিক ব্যাপারে তাঁর কোনো প্রভুত্ব নেই : তিনি সেখানে ঠুটো জগন্নাথ। সুদ আদান প্রদান, ব্যাংকিং, অর্থসঞ্চয়, কোম্পানী গঠন, অত্যধিক মুনাফার্জন প্রভৃতি বহু কিছু হালাল করতে হয়েছে তাকে। মোট কথা আধুনিক খৃস্টধর্ম নিউ টেস্টামেন্টের "For whosoever hath, to him shall he given, and he shall have more abundance but whoever hath not, from him shall be taken away even that he hath" (Mathew, xiii/12) ; বাণীটি পুঁজিবাদী বিশ্বে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ হতে দেখেও তার বিরুদ্ধে সামান্যতম উচ্চবাচ্য করছে না। একমাত্র গ্রেট বৃটেন ব্যতীত অন্য কোনো পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিজস্ব চার্চ নেই। বৃটেনের চার্চও প্রকৃতপক্ষে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান—এবং আসলে অলংকার মাত্র। ক্রমে ক্রমে আপ্ত-বাণীর (Revelation) স্থান অধিকার করে যুক্তি এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়। রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হতে ধর্মকে সরিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপার করা হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ইহজাগতিকতা। তার আগেই অবশ্য মেকিয়াভেলি তার পূর্বসূরী চাণক্য এবং আবু আলী আল হাসান (নিজামুল মুলক) তুসীর অনুসরণে রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত করেছিলেন। এশিয়ায় কিন্তু তখনও ভণ্ডামি মোনাফেকী অব্যাহত থাকে। Tawney এর কথায় "The theory of heirarchy of values, embracing all human interests and activities in a system of which the apex is religion is replaccd by the conception of separate and parallel compartments, between which a due balance should be maintained, but which have no vital connection with each other."

অবশেষে এলো মার্কিন স্বাধীনতা এবং মহান ফরাসী বিপ্লব। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহান নেতা জেফারসন, স্বাধীনতা ঘোষণা কালে বিশ্ববাসীকে জানালেন : "We hold these truths to be sacred and undeniable, that all men are created equal and independent that from that equal creation they derive rights inherent and inalienable, among which are the preservation of life, and liberty, and the pursuit of happiness." প্রথম উদ্বোধনী ভাষণে (১৮০১, ৪ঠা মার্চ) তিনি আরো বলেন, "Error of opinion may be tolerated where reason is free to combat it."

এবং ইয়োরোপে মহান ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মানুষের অধিকার সনদ প্রণয়ন করে বললেন :

1. Men are born and live free and equal as regards their rights. Social distinction can be based only on the common interest.

2. The end of every political organisation is the conservation of the natural and imprescritible rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to oppression.

3. The principle of all sovereignity resides essentially in the nation. No office and no individual can exercise an authority not expressly emanating from it.

4. Liberty consists essentially in being able to do whatever is not harmful to others, thus the exercise of the natural rights of each individual has no limits, except those which ensure to other members of society the enjoyment of these same rights. These limits can be determined only by law . . . etc.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

5. The law is the expression of general will. All citizens have the right to take part, either personally or through their representations, in its formation. The law must be equal for all, whether it protects or punishes . . .

মার্কিন সংবিধান রচনার লক্ষ্যও. . . . to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity . . . ইত্যাদি।

ফরাসী বিপ্লবের মানবাধিকার সনদ, জেফারসনের দৃপ্ত ঘোষণা এবং মার্কিন সংবিধানের উপক্রমনিকায় মানুষের ইহজাগতিক অধিকার এবং দায় দায়িত্বই উল্লিখিত হয়েছে: পারলৌকিক অধিকার অনধিকার সকল ধর্মেই ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত আছে বলেই সম্ভবতঃ তার কোনো উল্লেখ নেই। তা ছাড়া মানুষকেই তার সামাজিক জীবন যাপনের উপযোগী সংগঠন এবং বিধানাবলী রচনার সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি সভ্য পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে মোটামুটি উক্ত নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে। উত্তরকালে স্থাপিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বীজ ফরাসী মানবাধিকার সনদ এবং জেফারসনের ঘোষণার মধ্যে উপ্ত ছিল।

প্রসঙ্গত একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। ইহজাগতিকতার নীতি অনুযায়ী পরিচালিত প্রাচীন প্যাগান গ্রীস ও রোমে, তৎকালীন অবস্থায় যতটা সম্ভব, অত্যন্ত ব্যাপকভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল। প্রকৃতিকে জানা ও বোঝার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানব কল্যাণার্থে প্রকৃতিকে বশীভূত করার উপযোগী অথবা তার সহায়ক বহু রকমের বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং নানা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদিও ঐ যুগে আবিষ্কৃত হয়। যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক ইহজগৎকে ঈশ্বরের সরাসরি আধিপত্যাধীন করার পর প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ইয়োরোপের উপর পুনরায় আদিম বর্বরতার আধিপত্য স্থাপিত হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার প্রধান উপায় নিয়মিতভাবে শরীর ধৌত করা। কিন্তু ঐ সময়ে স্নান বর্জিত হয়: গাত্র চর্মের উকুন বধও সম্ভবতঃ পাপকার্য মনে করা হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মোতাজেলাবাদী অর্থাৎ যুক্তিবাদী দর্শনের জন্মের পরে (অষ্টম-নবম শতাব্দী) আরবগণ ব্যাপকভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করে। সম্রাট মামুন নিজে মোতাজেলাবাদী ছিলেন। তাঁর সময়ে প্রাচীন গ্রীক, ল্যাতিন, সংস্কৃত গ্রন্থাদির ব্যাপক অনুবাদ হয়। আরব মনীষীগণ প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেরা মৌলিক চিন্তায় মনোযোগ দেন এবং বহু নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংযোজন করে প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইমাম গাজ্জালী তার তাহফাতুল ফালসাফা (দর্শন বধ) নামক গ্রন্থ রচনা করে মুসলমানদের মস্তিষ্কে সীল মোহর মারেন। ঐ সীল মোহর মারার পরে মুসলিম জগৎ হতে ক্রমে ক্রমে অনুসন্ধিৎসা বিদায় গ্রহণ করে : জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক গোমরাহি সমগ্র মুসলিম জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অর্থাৎ খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক সরাসরি ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপনের পর মধ্যযুগীয় ইউরোপের যে হাল হয় গাজ্জালী পন্থী মুসলিম যাজক এবং রাজা বাদশাহের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে মুসলিম বিশ্বেরও অবিকল ঐ-দশা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, "ঈশ্বরের রাজত্ব" প্রতিষ্ঠার পর খৃষ্টান যাজক এবং শাসকদের ইহজাগতিক ভোগ বিলাস হ্রাস না পেয়ে বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তার প্রমাণ বহন করছে ইতিহাস ও ইয়োরোপীয় সাহিত্য। তেমনি গাজ্জালী-উত্তর গোমরাহি জমানার মুসলিম শাসক শ্রেণী এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী তথাকথিত ওলামায়ে কেরাম শ্রেণীর ইহজাগতিক ভোগ বিলাসও গোমরাহির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তার প্রমাণও বহন করছে তৎকালীন দরবারী ইতিহাস এবং সাহিত্য। ঐ কারণেই তুর্কী সাম্রাজ্যের সুলতান "ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তিতে" পরিণত হন এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র মুসলিম জগৎ রেনেসাঁ পরবর্তীকালীন ইহজাগতিক নীতিমালা অনুযায়ী শাসিত ইয়োরোপের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্যে আসে। বাংলাদেশ সহ মুসলিম জগৎ অদ্যাবধি ঐ গোমরাহি সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কোথাও কোথাও গোমরাহি প্রসারিত এবং দৃঢ় করার চেষ্টাও চলছে। ধর্মানুষ্ঠানকে নিছক প্রদর্শনীতে এবং শিল্প মেলাকে স্থূল আনন্দ মেলায় পরিণত করা হচ্ছে।

পক্ষান্তরে রেনেসাঁ বিপ্লবোত্তর ইহজাগতিক নীতিমালানুযায়ী শাসিত ইয়োরোপে পুনরায় প্রাচীন গণতান্ত্রিক শাসনামলের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ব্যাপকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। অনুসন্ধিৎসার ফলে বিগত আড়াই তিন শত বৎসর-কাল মধ্যে ইহজাগতিক (secular) ইউরোপ আমেরিকা যে বিপুল সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং মানব কল্যাণে নিয়োগযোগ্য আবিষ্কারাদি বিশ্ববাসীকে দান করেছে তৎপূর্ববর্তী পাঁচ হাজার বৎসর কাল মধ্যে সমগ্র মানব জাতির মিলিত প্রচেষ্টায়ও তা সম্ভব হয়নি। এখনও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। দার্শনিক চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল পরমাণু। সে পরমাণু এখন শুধু ধ্বংস করার কার্যে নয় মানব কল্যাণের কার্যেও ব্যবহৃত হচ্ছে। যে চাঁদকে গোমরাহি বশে পবিত্র মনে করা হয় সে চাঁদে অবতরণ করেছে ইয়োরো-মার্কিন সিকিউলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ। এই অভূতপূর্ব এবং আশ্চর্যজনক ইয়োরো-মার্কিন অগ্রগতির বিস্তারিত উল্লেখ অনাবশ্যক। নিঃসন্দেহে ঐ সব আবিষ্কারের ফলে সমগ্র বিশ্বের মানব জীবন সুখী, সমৃদ্ধ এবং উন্নত করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই বহুলভাবে উপকৃত হয়েছে মানব জাতি। এ কালেই শিল্প সাহিত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে এবং সে প্রক্রিয়া চলছে। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অবসান ঘটাতে পারলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির ফলে লভ্য সুযোগ সুবিধার প্রয়োগ ঘটিয়ে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জীবনকে সুখী, সুন্দর এবং অর্থবহ করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, অন্ন বস্ত্রের ধান্ধায় দিন রাত্রি ব্যাপৃত ক্ষুধার্ত রুগ্ন মানুষ কখনও ঠিক মতো ধর্মকর্মও করতে পারেন না। তাঁর প্রমাণ বাংলাদেশে আমাদের চোখের সামনেই অগণিত—শতকরা কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাট জন। অধ্যাপক সরোকিন হিসেবপত্র এবং রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহজাগতিক (secular) ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির সংখ্যা ও উন্নতি দেখিয়েছেন। তাঁর—"Ideational, idealistic and sensate" এই অতি সরলীকৃত শনিচক্রীয় (vicious circle) দর্শনের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু তাঁর উপস্থাপিত তথ্য তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইহজাগতিকতাই প্রকৃতপক্ষে মানব কল্যাণ সাধন করছে। "পৃথিবী ঈশ্বরের রাজ্য" বলতে যদি মানব কল্যাণ বোঝায় এবং আমার বিশ্বাস মানব কল্যাণের জন্যেই ধর্ম,তাহলে ইহজাগতিকতাই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীকে ঈশ্বরের রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম। থিওক্র্যাসি অর্থাৎ পুরোহিততন্ত্র হচ্ছে শ্রেণী বৈষম্য রক্ষা এবং শ্রেণী শাসন দৃঢ় করার জন্যে মানবকল্যাণবিরোধী শাসকশ্রেণী কর্তৃক উদ্ভাবিত বহু রকম কৌশলের একটি এবং গোমরাহি। মাঝখানে কিছু কথা রয়ে গেছে। ফরাসী বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লব হয়েছে,এসেছেন নেপোলিয়ন, হয়েছে মনার্কী অর্থাৎ রাজতন্ত্রের পুনর্বাসন : মানবিক সনদও লঙ্ঘিত হয়েছে—এখনও খোদ ইয়োরোপ আমেরিকার বহু দেশে হচ্ছে—কিন্তু বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীকে "স্বাধীন" চিন্তা করার এবং বিষয় সম্পত্তির উপর যে অধিকার প্রদান করে সেটা তারা ভোগ করছে। তারা বিষয় সম্পত্তির অধিকারকে ঈশ্বর অনুমোদিত জ্ঞান করলেও এবং যুদ্ধ বিগ্রহে জয়ী হওয়ার জন্যে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলেও পৌরোহিত্যাধিপত্য (theocracy) স্থাপন করে নি। নেপোলিয়ন প্রসঙ্গেও একটি বিষয় স্মরণীয়। তিনি ইয়োরোপীয় সামন্তবাদের অবশেষ নিশ্চিহ্ন করেন। তাঁর অভিযান ইয়োরোপে জাতিক রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক হয়। কিন্তু যা বলছিলাম। ফরাসী বিপ্লবের পরে নানা প্রতিবৈপ্লবিক এবং বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও, ইয়োরোপ আমেরিকায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে : দু' দুটি মহাযুদ্ধের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অগণিত জাতিক রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সমাজতান্ত্রিক আর্থসামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্ধতি। সমষ্টিগতভাবে মানুষের ইহজাগতিক সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করে মানুষকে পারলৌকিক পাথেয় সংগ্রহ করার সুযোগও সৃষ্টি করে দিয়েছে ইয়োরোপ। ইয়োরোপ আমেরিকার মানুষ ধর্মত্যাগ করে সবাই নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী হয়ে যায়নি : ধর্মকে রাষ্ট্র হতে পৃথক করেছে মাত্র। তার ফলে ধর্ম বহু রকমের অনাচারমুক্ত হয়ে তার মৌলিক মানব-কল্যাণকামী চরিত্র ফিরে পেয়েছে। একমাত্র ইংল্যাণ্ড ব্যতীত ইয়োরোপের অন্য কোথাও সম্ভবতঃ এখন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই—আছে মানুষের ধর্ম—যা নাকি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বৃটেন আবার পুঁজিবাদী ইয়োরোপ আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে অধিক ইহজাগতিক এবং মানবিক অধিকার পালনকারী রাষ্ট্র। মোট কথা পশ্চিমী জগতের সর্বত্র এখন "ঈশ্বরকে তার প্রাপ্য এবং সিজারকে (রাষ্ট্রকে) তার প্রাপ্য" দানের নীতি অনুসৃত। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার : আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষণ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। নাগরিক অধিকার, চিন্তা করা ও প্রকাশের অধিকার প্রভৃতি দান এবং হরণের ব্যাপারটাও সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, সুতরাং নিতান্তই ইহজাগতিক। এ সব অধিকারের মধ্যে freedom of worship প্রতিটি ইহজাগতিক (secular) রাষ্ট্রের নীতিমালা ও সংবিধানে স্বীকৃত। আধুনিক কালে হিটলার মুসোলিনী ব্যতীত অন্য কোনো ইয়োরো-মার্কিন রাজনৈতিক নেতা জাতি এবং শাসন পদ্ধতির পক্ষে ঐশ্বরিক অনুমোদন দাবী করেন নি। কিন্তু তাদের দাবী টিকে নি, তারা এবং তাদের পদ্ধতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইংলণ্ডের রাজা নামে মাত্রই "King by the Grace of God", আসলে তিনি একটি conception, আমাদের কথায় অলঙ্কার। দেশ শাসিত হয় ইহলোকবাসী মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা প্রণীত আইন কানুন অনুযায়ী ইহজগতে মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে।

কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি হলেও উপসংহারে কয়েকটি কথা বলতে চাই : প্রথমতঃ মুসার ধর্মমতে বিশ্বাসী ইয়াহুদীদের জন্যে "প্রতিশ্রুত ভূমির" ব্যবস্থা ওদের কেতাবে থাকলেও ওটা নিতান্তই একটি বিশেষ কৌমের (ইসরাইলী কৌম) ধর্ম। ইসলাম, ক্রিশ্চানিটি, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিশ্বধর্মে জাতিক রাষ্ট্রের (national state) ব্যবস্থা (provision) থাকা দূরের কথা তার কল্পনাও নেই। উক্ত বিশ্ব ধর্মাবলম্বীগণ এক একটি অবিভাজ্য মিল্লাত বা ধর্ম সম্প্রদায়। সমগ্র বিশ্ব এসব ধর্মের এলাকা। উক্ত তিনটি ধর্মের কোনো ধর্ম জাতিভেদ (ভৌগোলিক বা ভাষা ও সংস্কৃতিগত) স্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে মানব শাসিত ভৌগোলিক রাষ্ট্রের কল্পনাই ঐসব ধর্মে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য যে, হিন্দুত্ব প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয়—চতুর্বর্ণীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র এবং একমাত্র ভারতবর্ষই তার ক্ষেত্র। রাষ্ট্রচিন্তা নিতান্তই ইহজগদ্বাসী মানুষের মস্তিষ্কজাত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিক রাষ্ট্রের চিন্তাতো বটেই। সুতরাং জাতিক রাষ্ট্রের (national state) আবশ্যকতা এবং অবস্থান স্বীকার করে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহজাগতিকতাকেও (secularism) মেনে নেয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই যেমন উল্লেখ করেছি, ইসরাইলী পুরাতন টেস্টামেন্ট হতে আরম্ভ করে কোরান শরিফ পর্যন্ত সমস্ত revealed বা আসমানী কেতাবে লক্ষিত আইন কানুন বিধি বিধান ইহজগতে বসবাসকারী মানব জাতির শৃঙ্খলাপূর্ণ সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে বিশেষভাবে রচিত। ইহলোকে কৃত সামাজিক অপরাধের জন্যে দণ্ডের বিধান ইহলোকে। অপরদিকে সম্পত্তির স্বত্বস্বামীত্ব, উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি সম্পর্কিত বিধানাবলীও ইহলোকবাসী জীবিত মানুষের জন্যে। পরবর্তীকালে, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব বিধিবিধান কিছুটা রদবদল করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং ধর্মপুস্তকে বিধৃত থাকা সত্ত্বেও ওগুলো নিতান্তই ইহজাগতিক আইন। অবশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পূজার্চনা, উপাসনা, নামাজ, রোজা প্রভৃতির বিধানও ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু সেগুলোও ইহজগতেই পালনীয়। শেষোক্ত বিধানাবলী লঙ্ঘনের শাস্তি পরলোকে হবে তজ্জন্য ইহলোকে শাস্তিদানের বিধান বিশ্ব ধর্মগ্রন্থ সমূহে নেই। ঈশ্বর এক অপরাধের জন্যে দু'বার শাস্তি দেবেন না। ইসলামী বিধান মতে, মানুষের কাছে অপরাধ করলে মৃত্যুর আগে হয় আইনের বিধান অনুযায়ী তার দণ্ডভোগ অথবা ক্ষতিপূরণ করতে হবে। কোনোটাই না পারলে অন্ততঃ যার কাছে অপরাধ করা হয়েছিল তার মার্জনা নিয়ে মরতে হবে। ইহলোকে মানুষের কাছে কৃত অপরাধ মার্জনা করার ক্ষমতা আল্লাহ-তায়ালা তাঁর নিজ হাতে রাখেননি। এবাদত বন্দেগী না করলে কাউকে দণ্ড দেয়ার অধিকারও তিনি রাষ্ট্র বা মানুষকে দেননি। তবে প্রকাশ্যে ধর্মনিষ্ঠ লোকের মনে আঘাত দেয়া বারণ। তাহলেও, কোরানে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, লা ইকরাহাফীদ্দীনে—ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নিষিদ্ধ। রসূলাল্লাহকে বলা হয়েছে, আপনি সাবধানকারী মাত্র—সত্য পথ গ্রহণ করা না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। একমাত্র ইয়াহুদী ধর্মের ঈশ্বরই সম্ভবতঃ ইহলোকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন : তিনি smite অর্থাৎ বধ করেন : ইসরাইল গোষ্ঠীর মানবকুলকে মরুর তাপ হতে রক্ষা করার জন্যে উপরে ছায়া বিস্তার করেন এবং স্বর্গ হতে সরাসরি খাদ্য সরবরাহ করেন। কিন্তু আগেই বলেছি এটি বিশ্বধর্ম নয়, একটি বিশেষ মানব গোষ্ঠীর ধর্ম।

তৃতীয়তঃ ধর্মগ্রন্থে বিধৃত মূল নীতি এবং নির্দিষ্ট কতিপয় বিধিবিধান অনুযায়ী পরিচালিত কোনো ঐতিহাসিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের কল্পনাই যেখানে অনুপস্থিত সেখানে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে পারে না। প্রশাসনিক কাঠামোও সম্পূর্ণই মানব মস্তিষ্কপ্রসূত। শাসিত এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ার পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো রোমান ও পারসিক আদর্শে গঠিত হয়। পরবর্তীকালের কোনো মুসলিম রাজ্য বা সাম্রাজ্যে কোরান সম্মত আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা অবিকল কায়েম ছিল না, এখনও নেই। মুসলিম শাসিত রাষ্ট্র অন্য যে কোনো ইহজাগতিক (secular) রাজ্য ও রাষ্ট্রের ন্যায় রাষ্ট্র বা রাজ্যমাত্র ছিল এবং এখনও তাই। পৃথিবীর কোথাও খাঁটি ইসলামী রাজ্য বা রাষ্ট্র বা অপর কোনো খাঁটি ধর্মীয় রাজ্য বা রাষ্ট্র কখনও ছিল বলে মনে হয় না এবং এখনও নেই। জাতিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিল্লাতি ঐক্যও অন্তর্ধান করেছে। তার প্রমাণ মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার অগণিত মুসলিম রাজ্য এবং রাষ্ট্র।

চতুর্থতঃ মানুষের সংখ্যা, প্রয়োজন এবং বৈজ্ঞানিক সাধনালব্ধ নানা উৎপাদন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায় দায়িত্ব এবং প্রশাসনিক জটিলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো এবং অধিকাঠামোও ক্রমাগত বদলাচ্ছে। সাতরাপ, পাশা, মনসবদারদের দিয়ে যেমন এ যুগে দেশ শাসন করা চলে না তেমনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিও এখন রাজদরবারের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য যে, ইসলামে শতকরা আড়াই ভাগ ব্যতীত মুসলমানের জন্যে অন্য কোনো ট্যাক্সের বিধান যেমন নেই তেমনি রাজা, বাদশা, প্রেসিডেন্ট, খলিফা প্রভৃতি কোনো শাসকেরই কোরান শরীফ বহির্ভূত কোনো ফরমান জারি করার অধিকার স্বীকৃত নয়। রাজা, বাদশা হয়ে বসা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ অধিকার ভোগ করার অধিকারও ইসলাম ধর্ম কাউকে দেয়নি। 'বাইতুল মাল' ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ তহবিল অনুপস্থিত এবং তার উপর সকলের সমান হক। জেনা (ব্যাভিচার), লাহমুল খিঞ্জির (শুকরের মাংস), দ্বাম (রক্ত), মায়তাত (শব মাংস), খমর (মদ্য) প্রভৃতির ন্যায় রেবওয়া (সুদ) আদান প্রদানও সাফ হারাম। স্বদেশ বিদেশ হতে সুদে ঋণ গ্রহণ এবং সুদে ঋণ দান করা চলে না। ব্যাংক, ইন্সিউরেন্স কোম্পানী, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, ইকুইটি, শেয়ার মার্কেট, ডিবেঞ্চার ও ট্রেজারীবিল, লেটার অব ক্রেডিট, মাল হাতে নিয়ে আগাম বিক্রয় চুক্তি প্রভৃতি বহু কিছু বন্ধ হয়ে যায়। আবগারী কর, কাস্টমস শুল্ক, ভূমি রাজস্ব, আয়কর, বিক্রয় কর, মৃত্যুকর, কৃষিকর, জলকর, শিক্ষাকর, উন্নয়ন কর প্রভৃতি ধার্য করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অপরদিকে তেজারতি পেশারূপে স্বীকৃত হলেও তার মুনাফার হার নির্দিষ্ট করা নেই : সুতরাং ধর্মের দৃষ্টিতে চোরাবাজারি, মুনাফাখোরিও নেই : আইন করে জিনিসের মূল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ধারণ করা চলে না। দশ টাকার জিনিস একশ টাকায় বিক্রয় করা হালাল সম্ভবতঃ এ ধারণাবশেই মুসলিম ব্যবসায়িগণ চোরাকারবার, মুনাফাখোরিকে পাপ জ্ঞান না করে বরং পুণ্যজ্ঞানে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত আছেন এবং মুনাফার টাকায় বৎসারান্তে দশ বিশ হাজার টাকা দামের গরু কোরবানী, কিছু দান খয়রাত এবং হজব্রত সমাপন করে পুণ্যার্জন করছেন। তেমনি রসুলুল্লাহর জীবনটাকেই সুন্নত মেনে নিলে (তত্ত্বীয়ভাবে তাই স্বীকৃত) ভূ-সম্পত্তি সহ সর্বপ্রকার সম্পত্তির উপর হতে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পায় : উত্তরাধিকারীও হওয়া যায় না। রসুলুল্লাহ তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্যে কোনো সম্পত্তি রেখে যাননি। জীবদ্দশায় কয়েকটি খেজুর গাছ তিনি ভোগ করতেন : খলিফা আবু বকর সেগুলো তাঁর উত্তরাধিকারীকে ভোগ করতে না দিয়ে মিল্লাতের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করেন। পৃথিবীর কোনো মুসলিম রাষ্ট্র হুবহু কোরান শরীফের বিধান অনুযায়ী আগেও চলেনি এখনও চলছে না : ক্রমাগত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিক রাষ্ট্ররূপে অবস্থিতির অনতিক্রমন্য বাধ্য-বাধকতা যুগোপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ এবং অগণিত বেদাত অর্থাৎ নতুন আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তনে বাধ্য করেছে। সৌদী আরবে রাজতন্ত্র বিদ্যমান এবং হজের উপর ট্যাক্স ধার্য করা আছে। সৌদী সরকার এবং নাগরিকগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদে টাকা লগ্নি করেন। অপরদিকে সৌদী শাসক শ্রেণী মার্কিনী নাসারাদিগকে বন্ধু এবং অভিভাবকরূপে গ্রহণ ক'রে কোরান শরিফের বাণী অনুযায়ী তারাও তাদের (নাসারাদের) কাতারে চলে গেছেন (দ্রষ্টব্য : আলকোরান ৫ ; ৫১)। সৌদী আরব এবং পাকিস্তানে দেওয়ানী ব্যাপারে ধর্মীয় বিধিবিধান পদে পদে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এবং স্বদেশে বিদেশে সর্বত্রই উপরতলার শাসক শ্রেণী ফৌজদারী ব্যাপারেও ধর্মীয় বিধান বেপরোয়া লঙ্ঘন করছেন। সুতরাং নাম যাই হোক ঐগুলোও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহজাগতিক রাষ্ট্র। চুরির কারণ দূর না করে চোরের হাত কাটলে, জনসাধারণ ন্যায্য দাবী দাওয়া উত্থাপন অথবা শাসক শ্রেণীর জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে গুলী চালিয়ে মানুষ মারলে, অঙ্গের বদলে অঙ্গ নিলে এবং জেনার জন্য দোররা মারলে সুপ্রাচীন ইহজাগতিক ফৌজদারী আইনগুলো শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্যে গরীবের উপর বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয় মাত্র—ইসলামী রাষ্ট্র বা ধর্মরাষ্ট্র স্থাপন করা হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে সৌদী আরব এবং পাকিস্তান সম্ভবতঃ বর্তমান পৃথিবীর নিকৃষ্টতম দু'টি ইহজাগতিক রাষ্ট্র। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ একটি বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবাদ। সাধারণ মানুষকে চিরকাল গোমরাহিতে আচ্ছন্ন রেখে স্বশ্রেণীর জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা ভোগ বিলাসের জীবন স্থায়ী করতে চায় বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র তারাই ধর্মের লেবাস পরে রাজনীতি করে। কোরানের ভাষায় ওরা মোনাফেক এবং রিয়াকার : সাধারণের ভাষায় ওরা ফেরেববাজ, দাগাবাজ এবং ভণ্ড। প্রসঙ্গত, আরো একটি বিষয় স্মরণীয়। মুসলমান হয়ে মুসলমানকে হত্যা করা কোরান শরীফে নিষিদ্ধ। মুসলমানে মুসলমানে বিরোধ বাধলে সে বিরোধ সালিশিতে মীমাংসা করতে হবে। কোনো পক্ষ সালিশির রায় না মানলে সকলে মিলে অমান্যকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। সেই পক্ষ রায় না মানা পর্যন্ত যুদ্ধ করার বিধান আছে বটে, কিন্তু এমন একটি দৃষ্টান্তও কি ইতিহাস হতে উল্লেখ করা যায় যে ক্ষেত্রে কোরানের ঐ নীতি মাফিক মুসলমানেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? যায় না। গোড়াতেই তাঁরা মিল্লাতের নীতি ভঙ্গ করে অগণিত রাজ্য ও রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। তারপর নিছক আধিপত্য বিস্তার বা রক্ষার জন্যে মুসলমান প্রতিপক্ষীয় মুসলমানদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করেছে। মুসলমান পৃথিবীতে যত মুসলমান হত্যা করেছে ইয়াহুদী, নাসারা, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী মিলেও সম্ভবতঃ এত বেশী সংখ্যক মুসলমান অদ্যাবধি হত্যা করতে পারে নি। সর্বশেষ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে পাকিস্তানবাসী তথাকথিত মুসলমানগণ বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়ে। এর চেয়ে ধর্মবিরোধী স্থূল ইহজাগতিকতা (vulgar secularism) আর কি হতে পারে?

পঞ্চমতঃ পৃথিবীটা এখন অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে। রেষারেষি, হানাহানি, অশান্তি, অসন্তোষ, যুদ্ধবিগ্রহ, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র এখন কমবেশী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিচ্ছিন্নতা (isolation) অসম্ভব। তাই কতগুলো সাধারণ নীতি—বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—সব রাষ্ট্রকেই মেনে চলতে হয়। ইচ্ছা থাকলেও এ যুগে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে সরকার চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়াও প্রায় জাতিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বসবাস করছে। নাগরিকদের সমান অধিকার মেনে নিলে আইন সম্প্রদায় বিশেষের জন্যে আলাদা হতে পারে না। উত্তরাধিকার এবং বিয়েশাদি সংক্রান্ত কতিপয় বিধি বিধান ব্যতীত বাকী সমস্ত দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আইন বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিক রাষ্ট্রেই ইহজাগতিক প্রয়োজনে যুগ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইহজগদ্বাসী মানুষ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং নিত্য নতুন তার সংশোধন ও সংযোজন ঘটছে। এ কারণেই কেস্‌াস অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার নীতি বহু পূর্বেই মুসলমান সহ পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম সহ জগতের সকল প্রচলিত ধর্মমত অনুযায়ী ব্যক্তি তার ইহজগতের কৃতকর্ম অনুযায়ী পরলোকে উদ্যান অথবা অগ্নিদহন ভোগ করবে। সমষ্টিগতভাবে কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়কে বেহেশত ভোগ করার অধিকারও যেমন দেয়া হয় নি, তেমনি সমষ্টিগতভাবে দোজখের বিধানও ধর্মগ্রন্থে নেই। সুতরাং ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় ধর্মকর্মও যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। পক্ষান্তরে ইহজাগতিক মানবজীবনকে কোনো ক্রমেই সমষ্টিগত সামাজিক জীবন হতে পৃথক করা যায় না। উপাসনা একা করা সম্ভব, তাঁর বিধানও আছে, কিন্তু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার সংসার এমন জটিল যে সেখানে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ব্যৈক্তিক জীবন অকল্পনীয়। রাষ্ট্র সুশৃঙ্খলভাবে সমষ্টিগত ইহজাগতিক জীবন যাপনের বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট মানবমস্তিষ্ক প্রসূত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র আসমানী অবদান নয়। অতএব, রাষ্ট্র মাত্রেই ইহজাগতিক (secular) হতে বাধ্য।

ষষ্ঠতঃ উকিল, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার; কারিগর, বিজ্ঞানী ইত্যাদি বিশেষজ্ঞদিগকে এ যুগে কোনো রাষ্ট্রে কখনও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয় না : বাস্তবেও সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত জীবনেও কেউ ভিন্নধর্মাবলম্বী বড় ডাক্তার বর্জন করে স্বধর্মে নিধন হওয়া শ্রেয় জ্ঞানে স্বধর্মীয় হাতুড়ে চিকিৎসক নিয়োগ করে না। সৌদী বাদশা নাসারা পরিচালিত হাসপাতালে বেগানা নাসারা আওরত নার্সের পরিচর্যা এবং নাসারা ডাক্তারের চিকিৎসা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে গ্রহণ করেছেন এবং তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিলের কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছেন : হজরত ওমরের আদর্শ অনুসরণ করেননি। অপরদিকে চাষী, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, অস্ত্রনির্মাতা, কলকারখানার মালিক যে ধর্মাবলম্বীই হোক, উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করার সময় ধর্মমত নির্বিশেষে সকলেই উৎপাদনকারীর কাছে যায়, স্বধর্মীয় পুরোহিতের কাছে কেউ যায় না। তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র সৌদী আরবে প্রায় এক লাখ নাসারা বিশেষজ্ঞ আছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইহজগতের কতগুলো স্বাভাবিক আইন আছে, বনবাসী না হয়ে সেগুলো লঙ্ঘন করার সাধ্য অতিবড় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরও নেই। রাষ্ট্র আবহমানকাল হতেই কার্যতঃ ইহজাগতিক। স্বার্থান্বেষী মোনাফিকেরাই শুধু ভিন্ন নাম ব্যবহার করে সরল বিশ্বাসী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। এই ভণ্ডামি মোনাফেকি কখনও কখনও অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে।

প্রচলিত আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি যখন অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ করতে ব্যর্থ হয়, পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালেও শাসক শ্রেণী তার কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণার্থে জরাজীর্ণ পদ্ধতির মধ্যেই সমাধান খুঁজে বেড়ায়। প্রত্যাসন্ন আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের আশঙ্কায় তারা তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগ্রত করে তাদিগকে বিভ্রান্ত ও বিপথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালিত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। নিজেরা যে সমস্ত বিধি পালন করে না, পালন করা সম্ভবও মনে করে না, এমন কি ওসব বিধিবিধানে আস্থাশীলও নয়, জনসাধারণের জন্যে তারা ঠিক ঐগুলোই ব্যবস্থাপত্র রূপে (prescription) বিতরণ করে। ভণ্ডামি মোনাফেকী তখন সুসংগঠিত পদ্ধতিতে পরিণত হয়। মনীষী জন উইলিয়ম ড্রেপার (John William Draper) কথাগুলো এ ভাবে বলেছেন : "Between that period during which a nation has been governed by its imagination and that in which it submits to reason, there is a melancholy interval. The constitution of man is such that, for a long time after he has discovered the incorrectness of the ideas prevailing around him, he shrinks from openly emancipating himself from their dominion, and constrained by the force of circumstances, he becomes a hypocrite, publicly applauding what his private judgement condemns. Where a nation is making this passage, so universal do these practices become that it may be truly said, hypocracy is organised. It is possible that whole communities might be found in this deplorable state... Even after ideas have given way in public opinion, their political power may outlive their intellectual vigour, and produce the disgraceful effect we here consider."

আমাদের দেশে intellectual vigour কতটা আছে জানিনা, তবে ড্রেপার বর্ণিত ক্রান্তিকাল যে চলছে তদ্বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ইহজাগতিকতা reason অর্থাৎ যুক্তি ও ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মানব কল্যাণকর আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অভিজ্ঞতা এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ মানব মস্তিষ্ককে যুগপৎ যুক্তি ও কল্পনাপ্রবণ করে তোলে। অভিজ্ঞতা তাকে ভুল সংশোধন করায়, কল্পনা তাকে ভবিষ্যৎ জীবনকে অধিক সার্থক ও অর্থবহ করার পন্থা উদ্ভাবনে সহায়তা করে। কল্পনা কখনও কখনও ভ্রান্ত পথেও পরিচালিত করে। বাংলাদেশের মানুষ ১৯৪০ সালে উদ্ভট কল্পনাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ সম্ভব মনে করেছিল। তিরিশ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ঐ ভুল ভাঙাতে কতকটা সাহায্য করে। মনে হয়েছিল, ১৯৭১ সালের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিবা বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়েছে : কল্পনাকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে পদক্ষেপ করতে শিখেছে। কিন্তু আমাদের অনুমান ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের উপর এখনও organised hypocracy-র আধিপত্য চলছে। বিদ্বান, বুদ্ধিজীবী, বিদগ্ধ প্রভৃতি বিশেষণের ভূষণে ভূষিত আমাদের ন্যায় ব্যক্তিরাও এই organised hypocracy-র সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীগত লালসা পূরণার্থে কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছি। তবু আমি আশাবাদী। পরিণামে যুক্তির জয় হবেই। যুক্তির জয়ের অর্থ organised hypocracyর উপরে মনুষ্যত্বের জয়। এ জয় অনিবার্য। নতুবা আমরা আদিম বর্বরতার (savagery) যুগে ফিরে যাবো।

বাংলার কবি বাঙালীকে শুনিয়েছেন :

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই ॥

এই একটি বাক্যের মধ্যেই ইহজাগতিকতার সমস্ত ব্যাখ্যা বিদ্যমান। বাংলার মানুষ কি বাঙালী কবির বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করবে না?

গ্রন্থপঞ্জী

১. Morgan — Ancient Society.
২. Max Muller — Six Systems of Indian Philosophy.
৩. Max Weber — Religion of India.
৪. Aristotle — Politics.
৫. Plato — Republic
৬. Myers — Ancient History
৭. George Sabine — History of Political Theory.
৮. Bertrand Russel — History of Western Philosophy
৯. R.H. Tawney — Religion and the Rise of Capitalism
১০. P.A. Sorokin — The Crisis of Our Age.
১১. J.W. Draper — History of the Intellectual Development of Europe.
১২. Redford & others — Politics and Government in the United States.
১৩. Tarachand — Influence of Islam on Indian Culture.
১৪. Bible — Old & New Testament.
১৫. অতীন্দ্র মজুমদার—চর্যাপদ
১৬. Ameer Ali—A Short History of the Saracenes.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবার উপরে মানুষ সত্য

এখন হতে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রোটাগোরাস না কি বলেছিলেন, man is the measure of all things অর্থাৎ মানুষ সব কিছুর মানদণ্ড। অনেক পরবর্তীকালে পোপ বলেছিলেন, The proper study of mankind is man অর্থাৎ মানবজাতিকে ভালোভাবে জানার উপায় মানুষ। বাঙালী কবি চণ্ডীদাস পোপের আগের লোক। তিনি বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

গুণীজনের উক্তি উদ্ধৃত করে আমি এ-কথাটাই বোঝাতে এবং বুঝতে চাই যে, metaphysics অধিবিদ্যা হোক আর physics পদার্থবিদ্যা হোক, বিদ্যা চর্চা করে মানুষ। কেন করে? করে মানব-সমাজকে জানার জন্যে—মানুষের শক্তি কতটুকু বোঝার জন্যে এবং নৈসর্গিক জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে মানব সমাজকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠার জন্যে। এই জানার কাজটাই বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা।

সংশয় ও সংশয়-জনিত অনুসন্ধিৎসা জানা অর্থাৎ জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। সংশয় ও অনুসন্ধিৎসা সমাজবদ্ধ জীবন যাপনকারী মানবজাতির গুণ। জন্মগত জৈব-ধর্ম পালনের বাইরে বিচ্ছিন্ন মানুষের অন্য কোনো গুণ নেই। শিশু যদি ঘটনাচক্রে জনমানবহীন বনে একা মানুষ হয় তা'হলে সেও হয়ে যায় কিপলিঙের মৌগলিস ব্রাদার্সদের (Mowglis brothers) একজন অর্থাৎ জঙ্গলের পশু। পরিণত বয়সে তাকে উদ্ধার করে আনলে সে সমাজ-বদ্ধ মানুষের ভাষা বোঝে না। পশুর যেমন সংশয় ও অনুসন্ধিৎসা নেই, যা কিছু সে করে তার সব কিছুই স্বাভাবিক জৈবস্বভাবজাত ক্রিয়া, তেমনি সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন মানুষ জীব হিসাবে বেঁচে থাকলেও তার মধ্যে স্বোপার্জিত জ্ঞানের নিদর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। সাগর মহাসাগরের দ্বীপে বৃহত্তর মানবসমাজ হতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী এমন কিছু কিছু মানুষের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় যাদের কথা-বার্তা খুব অল্পসংখ্যক ধ্বনির মধ্যে সীমাবদ্ধ। হাজার হাজার বছর যাবৎ ওরা একই অবস্থায় আছে।

সব পশুই কিছু কিছু ধ্বনি করতে সক্ষম। কিন্তু ভাষা একমাত্র সমাজ বদ্ধ মানব জাতির সম্পদ। ভাষা সমাজবদ্ধ মানবজাতির সংশয়ী ও অনুসন্ধিৎসু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্তিষ্কের সবচেয়ে বিস্ময়কর ফসল। আমরা বোধ করি ভাষায়; পরস্পর কথা-বার্তা বলি ভাষায়; স্বপ্নও দেখি ভাষায়। এই ভাষা কোনো এক ব্যক্তির অবদান নয়, স্বর্গ হতে পতিত বস্তুও নয়। একটি একটি করে ইট বা পাথর গেঁথে যেমন দালান তৈরী করা হয় তেমনি ধ্বনির সঙ্গে নতুন নতুন ধ্বনি যোগ, শব্দের সঙ্গে নতুন নতুন শব্দ যোগ এবং সব শেষে যৌগিক ধ্বনি পৃথক এবং পৃথকীকৃত মূল ধ্বনির সংখ্যা নিরূপণ এবং তার প্রতীকচিহ্নরূপে অক্ষর প্রবর্তন—এ ভাবে ক্রমে ক্রমে হাজার হাজার বছরের সাধনায় ভাষা নির্মাণ ও তার বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীবন যাপনকারী মানব সমাজ। ভাষা মানব জাতিকে তার আজকের অবস্থানে এগিয়ে নিয়ে এসেছে।

ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিষয়টা উল্লেখ করতে হচ্ছে : কেননা ভাষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানব-সমাজের সংশয় ও অনুসন্ধিৎসা শক্তিও বিকাশ লাভ করেছে। অপর দিকে ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ কোনো বিচ্ছিন্ন একক ঘটনা নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ সমাজের বিশেষ ধরনের আর্থ-সামাজিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ভাষার শ্রী ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য কথায় মানব জাতির কোনো কর্মকাণ্ডকে তার সামগ্রিক জীবন হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। ভাষার দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতা জাতির দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতাই প্রমাণ করে। অধিক ফসল ফলাবার জন্যে ব্যাপকভাবে কৃষির কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার পর লাঙল আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের ভাষায় লাঙল শব্দটি আছে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের জুম চাষীদের ভাষায় লাঙল শব্দটি নেই। এই সামান্য দৃষ্টান্তটি দিয়ে আমি এ-কথাটাই বোঝাতে চাই যে, সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন পদ্ধতি এবং সামাজিক জীবন পরিবর্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়েছে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের সংশয় এবং অনুসন্ধিৎসা অর্থাৎ জিজ্ঞাসা এবং তার জবাব পাওয়ার নেশা। এই জিজ্ঞাসা এবং তার জবাব খোঁজার প্রবৃত্তি আসলে প্রকৃতির খেয়াল-খুশি হতে মানব-জীবনকে মুক্ত করার মানবিক গুণ। খেয়ালী প্রকৃতির সংহারী মূর্তিকে তুষ্ট করার জন্যে ব্যবহৃত নানা তুকতাক জাদুমন্ত্র পূজার্চনা প্রভৃতির ব্যর্থতা দেখেই মানুষ তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশীভূত করার আবশ্যকতা অনুভব করে। এ অনুভূতি তার মস্তিষ্কে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রথা পদ্ধতির কার্যকরতা সম্বন্ধে সংশয় জাগ্রত করে : সংশয় জাগ্রত করে অনুসন্ধিৎসা। এই সংশয় এবং অনুসন্ধিৎসাই মানব জাতিকে দাসত্বপ্রথা ভিত্তিক ধর্মান্ধ সামাজিক পদ্ধতি হতে আজকের বিজ্ঞান ও টেকনলজি ভিত্তিক ধর্ম-নিরপেক্ষ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় একমাত্র হাতিয়ার রূপে কাজ করেছে। বিজ্ঞান ও টেকনলজির সহায়তায় মানুষ তার পরিবেশকে যত বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বশীভূত বা পরিবর্তিত করছে ততই তারা বংশগতিক্রমে লব্ধ নানা অন্ধ কুসংস্কার এবং অভ্যস্ত চিন্তার দাসত্ব হতে মুক্ত হচ্ছে।

সংশয় ও অনুসন্ধিৎসা হতে দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব। এ-প্রসঙ্গে পরলোকগত মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদের কিছু উক্তি মনে পড়ছে। তিনি যখন ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী তখন বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের তত্ত্বাবধানে এবং ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে History of Eastern and Western Philosophy নামক দু'খণ্ডে সমাপ্ত একটি বই রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। মাত্র ১৩ পৃষ্ঠার এ-ভূমিকার শুরুতে তিনি জনৈক ইরানী কবির দু'টি পঙক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পঙক্তি দুটোর সারমর্ম এই : পৃথিবী এমন একটি গ্রন্থ যার প্রথম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। উদ্ধৃতির পর মওলানা আজাদ নিজে যে বক্তব্য রেখেছেন তার সারার্থ এই : দার্শনিকগণ পৃথিবী নামক এ-গ্রন্থের উক্ত হারানো পৃষ্ঠা দুটো উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। সে চেষ্টা এখনও সফল হয় নি। কিন্তু ব্যর্থও হয়নি। হারানো পাতা দু'টি উদ্ধার প্রচেষ্টারই ফল সকল শাখা প্রশাখার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনলজি। অর্থাৎ মওলানা আজাদ দর্শন শাস্ত্রকে সকল বিদ্যার জননী বলেছেন। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে শুধু এটুকু যোগ করাই যথেষ্ট যে অদ্যাবধি লব্ধ আমাদের জ্ঞান বলে, সূর্যের মতো আরো কোটি কোটি নক্ষত্রসঙ্কুল মহাবিশ্বের আরম্ভও নেই শেষও নেই। এবং এই মহাবিশ্ব না কি আবার ফুৎকারে প্রস্ফীত বেলুনের ন্যায় সততঃ তার আয়তন বৃদ্ধি করছে। যে-বস্তু আদি অন্তঃহীন তার পরিবৃদ্ধি চিন্তা করা যায় না। সে যা হোক, হারানো পত্রদ্বয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ মহাবিশ্ব নামক নক্ষত্রলোকের অনেক তথ্য জেনেছে। চন্দ্র ছিল এযাবত পবিত্র, সেই চন্দ্রে অবতরণ, মলমূত্র ত্যাগ এবং সেখানকার 'মৃত্তিকা' মুঠোয় করে নিয়ে এসে মানুষ প্রমাণ করেছে যে, পৃথিবীর মতো চন্দ্রেরও পবিত্রতা অপবিত্রতা নামক দু'টি সামাজিক বোধের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করা মানে সব কিছু জানা নয়। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ নানা প্রাচীন পুঁথি পুস্তক এবং দালানকোঠার ভগ্নস্তূপ ঘেঁটে যে-সব তথ্য সংকলন করেন তার মূল্য আছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পুরস্কৃতও করে। কিন্তু সংকলন মৌলিক জ্ঞান নয়; অসংখ্য মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলো প্রয়োগ করে মানব জীবনকে অশ্রুতপূর্ব সমৃদ্ধ করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমরা জানি না মহাবিশ্ব কেন আছে? কি আবশ্যকতা ছিল মহা অস্তিত্বের? আমরা মহা অস্তিত্বের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু। আমাদের জন্ম-মৃত্যু আছে। অর্থাৎ আমরা সসীম। আদি অন্তহীন অস্তিত্বের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসবাস করে আমরা nothingness-কিছুই-নেই-অনস্তিত্ব চিন্তাও করতে পারি না। অন্ধকারও অস্তিত্ব, শূন্যতাও অস্তিত্ব, এমন কি অনস্তিত্বও তো এক ধরনের অস্তিত্ব। কিন্তু এই কেন'র জবাব জানি বা না জানি তাতে কিছু আসে যায় না। আমার বক্তব্য : আদি অন্তহীন অথচ সততঃ সম্প্রসারণ-শীল মহাজাগতিক অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে হলে মানুষের চিন্তাশক্তির সীমা বেধে দেয়া চলে না ; বলা চলে না, Thus far and no further.

সর্বেশ্বরবাদ যে স্তরে গিয়ে অদ্বৈতবাদে পরিণতি লাভ করেছে সেখানে মানুষে ঈশ্বরে ভেদাভেদ নেই। মনসুর হাল্লাস বললেন, আমিই সেই পরম সত্য। শঙ্করাচার্যে তার সমর্থন ছিল। আমিই সেই পরম ও চরম সত্যে উন্নীত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করার আবশ্যকতা নেই। কেননা সেই পরম ও চরম সত্য শুধু আদি অন্তহীন নয়, শঙ্করাচার্যের মতে নিরাকার নির্বিকার এবং নির্গুণ। এ-ধরনের সত্তার উপর সাকার, সগুণ, বিকাশশীল এবং জন্মমৃত্যুর অধীন মানব সমাজের কোনো বিধি বিধান আইন কানুন প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ "পরম ও চরম সত্যে" উন্নতি লাভ করল অর্থাৎ "আমিই সেই" হয়ে গেল, তাদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা চলে না, "তোমার ভাবনাচিন্তার সীমা ঐ প্রস্তরফলক পর্যন্ত, তার বাইরে এক কদমও যেতে পারবে না ; গেলে তোমাকে কতল করা হবে।" ফ্রেডরিক নিটশে সম্ভবতঃ এ চিন্তাটাকেই আরো একটু পরিমার্জিত করে বলেছিলেন, God is dead—ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে এবং dead God-এর শূন্য স্থানে স্থাপন করেছিলেন superman বা অতিমানবকে। বলা বাহুল্য, নিটশের অতিমানব সামাজিক আইন কানুনের উর্ধ্বে। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরশিপের বিভিন্ন তত্ত্বীয় ভিতের মধ্যে নিটশীয় তত্ত্বের ভূমিকাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি উল্লেখ-যোগ্য। ফ্যাসিবাদকে আমি ঘৃণা করি : আমি মনে করি, সমাজের বাইরে একক মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই ; এবং নেই যে, তার প্রমাণস্বরূপ এই সামান্য যুক্তিই যথেষ্ট যে, স্বাধীনতা-পরাধীনতা নামক বোধের উদ্ভব সামাজিক এবং পরিবেশগত অবস্থান হতে। এখানে intuition অর্থাৎ সজ্ঞার বিষয়টি আসতে পারে জানি। কিন্তু সজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট ঘটনা অথবা বিশেষ পরিবেশ-গত অবস্থার তাৎক্ষনিক জৈব প্রতিক্রিয়া। বিপদ দেখলে, উটপাখী বালিয়াড়িতে মাথা গোঁজে, কচ্ছপ তার মাথা গুটিয়ে নেয়। সুযোগ-সুবিধা দেখলে আনন্দও করে। সমুখে বাঘ দেখলে নিরস্ত্র মানুষ পালায়, অথবা গাছে আরোহন করে, আবার দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত কোনো যানবাহন দেখলে তার মাল লুটও যেমন করে কিছু লোক তেমনি কিছু কিছু মানুষ যাত্রী এবং তাদের মালসামান উদ্ধারও করে। এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বশে কৃত তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার গুণাগুণ বিচার করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলে সজ্ঞাজাত কর্ম বলে কিছু থাকে না; কেননা গুণাগুণ সামাজিক বোধ। দু'চার দিনের ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে আহার্য পড়লে তার সজ্ঞাজাত প্রতিক্রিয়া হলো ক্ষুধার্ত পশুর মতো সেই আহার্য ভক্ষণ—সাধুতা বা চৌর্য বৃত্তির পার্থক্য নির্ণয় নয়। এখানে সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা রচনার বিষয় উত্থাপিত হতে পারে। সামাজিক এবং পরিবেশগত ঘটনাবলী এবং দৃশ্য কবির মনে যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে ঠিক সেটাই কবিতা নয়। কবিতা সমাজে প্রচলিত সুসংবদ্ধ ভাষায় রচিত। সুতরাং রচিত হওয়া মাত্র এটা সামাজিক বস্তু হয়ে যায়। তার গুণাগুণ বিচার করে সমাজ। যে কবি বলেন, বিশৃঙ্খল মন আমার পবিত্র ধন, তিনিও সামাজিক ভালোমন্দ বোধের বাইরে অবস্থান করেন না; কেননা শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা পাগলামি এবং সুস্থতাও সামাজিক বোধ। নিটশের একটি উক্তির আলোচনাকে এতদূরে নিয়ে আসার কারণরূপে আমার বক্তব্য এই যে, অতিমানব নয়, সকল মানুষই জন্মকালে নগ্ন শিশু এবং অজ্ঞ। সুতরাং জ্ঞানী হওয়ার, এবং সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে যতখানি স্বাধীন হওয়া বা বা স্বাধীন চিন্তা করা তার পক্ষে সম্ভব তা করার অধিকার মানব জাতির জন্মগত অধিকার—বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা অতিমানুষের নয়। নিটশে ব্যক্তি মানুষকে সবার ওপরে সত্য না বলে যদি চণ্ডীদাসের মতো বলতেন, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, তা' হলে কোনো আপত্তির কারণ থাকতো না। এখানে সর্বেশ্বরবাদ সম্বন্ধেও দু'টি কথা বলে নেয়া আবশ্যক মনে করি। রবীন্দ্রনাথ মাত্র দু'টি পঙক্তির মধ্যে সর্বেশ্বরবাদের নির্যাস আমাদের জন্যে পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন,

সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর—
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত সুমধুর।

অসীম তার অসীমতার মধ্যে থেকেই তার সুর বাজান আর সীমার মধ্যে অবস্থান করেই তার সুর বাজান সে-সুর শুধু 'মধুর' হবে না 'অসীমও' হবে। তাই সসীমের চিন্তা-ভাবনার সমুখেও কোনো দেয়াল তোলা যাচ্ছে না। একমাত্র সীমারেখা হচ্ছে, সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবেই সে চিন্তা করে; এবং "ভাষার অতীত তীরে" অস্তিত্ব থাকলেও চিন্তাশক্তি নেই।

অপরদিকে একেশ্বরবাদ যে পর্যায়ে গিয়ে আদি অন্তহীন নিরাকার সগুণ ঈশ্বর কল্পনায় উন্নীত হয়েছে, সেখানে ঈশ্বর প্রাণীজগৎ সহ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। সেখানে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট বস্তু পৃথক পৃথক সত্তা। ঈশ্বর সততঃ আছেন থাকবেন তাঁর উদ্ভব ও ধ্বংস নেই—জন্ম মৃত্যু নেই। তার সৃষ্ট বাকী সব কিছু বিলীন হচ্ছে এবং হবেও। এ-মতের ঈশ্বরচিন্তা হতে এ-অনুসিদ্ধান্তে আসাই যুক্তিসঙ্গত যে, যেহেতু ঈশ্বরসৃষ্ট সব বস্তুরই আদি অন্ত উদ্ভব ধ্বংস এবং জন্ম মৃত্যু আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং মানব-সমাজে প্রচলিত সমস্ত প্রথা পদ্ধতি ও মতামতেরও উদ্ভব এবং অবসান আছে। অবশ্য অবসান না বলে বিবর্তন শব্দটিও ব্যবহার করা যায়। মানব-জীবন পরম্পরাক্রমে প্রবহমানতা। মৃত ব্যক্তির স্থান পূরণ করছে নবাগত ব্যক্তি। এই অনুক্রমের মধ্যে বিবর্তিত হচ্ছে মানব-সমাজের সমস্ত ইতিহাস। সুতরাং দ্বিতীয় মতের ঈশ্বর চিন্তায়ও মানুষের চিন্তাশক্তির অগ্রাভি-যানের পথে কোনো প্রাচীর তোলা যায় না : বলা যায় না, Thus far and no further. অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ কথাটাই আরো স্পষ্টভাবে বলেছিলেন।

মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।
ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে।
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।—মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য এই যে, বাংলাদেশের মতো অনুন্নত অঞ্চলের মানব-সমাজে এই সাধারণ যুক্তির কথাগুলোও মানা হয় না। যারা সীমা-সরহদ্দ বেঁধে দেয়, প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেয় তারা মূর্খ নয় : ওদের মধ্যে সকলেই কেতাবী বিদ্যায় বিদ্বান—অনেকে দার্শনিকরূপেও খ্যাত।

প্রসঙ্গত অষ্টাদশ শতাব্দীর মনীষী হেলভেটিয়াসের (Helvetius) নামটা মনে পড়ছে। তাঁর সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখেছেন, "Helvetius considered the differences between individual's interst due to differences of education, in every individual, his talents and his virtues are the effect of his instruction. Genius, he maintains, is often due to chance ; if Shakespeare had not been caught poaching, he would have been a wool merchant. His interest in legislation comes from the doctrine that the principal instructor of adolescence are the forms of Government and the consequent manners and customs. Men are born ignorant, they are made stupid by education."

মূল কথাটা হচ্ছে, জন্মকালে মানুষ অজ্ঞ, বিদ্যা তাকে নির্বোধ বানায়। একালে বিদ্যাশিক্ষা দেয় সরকার। পৃথিবীর সকল দেশের সরকারের আলাদা শিক্ষাবিভাগ আছে। কোনো কোনো সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ও আছে। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে শিক্ষাদানের বিষয়টা পুরোহিততন্ত্রের অধীনে ছিল। শিক্ষা গ্রহণও করতো প্রধানতঃ পুরোহিত শ্রেণী। নাম স্বাক্ষর করতে অক্ষম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজ-রাজড়াদের নামও ইতিহাসে পাওয়া যায়। সমকালীন উৎপাদন পদ্ধতির অধিকাঠামো রাষ্ট্র এবং তার গভর্নমেন্ট। শাসকশ্রেণী প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রথা-পদ্ধতির রক্ষক আগেও ছিল এখনও তাই। বিরল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সেকাল একাল সবকালেই পুরোহিতরা প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রথা পদ্ধতির রক্ষক শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে; কেননা পরিবর্তন উভয় পক্ষের স্বার্থ-হানিকর হবে বলে ওরা ভেবেছে। সুতরাং শাসিত ও শোষিত জনসাধারণকে "stupid" তৈরীর উপযোগী শিক্ষাদান করাটাই সরকার এবং পুরোহিততন্ত্র যুক্তিযুক্ত মনে করেছে। ঐ নীতির ফলে বহু সু-প্রাচীন সভ্যতা ও জাতি ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়েছে। প্রাচীন মিশরের পুরোহিত শ্রেণী সে দেশের জনসাধারণ এবং রাজ-রাজড়াদের মমি শিল্প (mummy industry)-তেই নিযুক্ত রাখল, ওদের গণিত ও জ্যামিতি জ্ঞান অন্য কোনো কাজে লাগল না। যুক্তি বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রে গ্রীক মনীষীদের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই: কিন্তু ওরাও দাসদের প্রাণী মনে করতো--মানুষ জ্ঞান করতো না। এ যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই সাক্ষরতা প্রসার লাভ করেছে: কিন্তু সাধারণ ভাবে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পদ্ধতিতে শাসিত সকল অঞ্চলে এবং বিশেষভাবে আধা পুঁজিবাদী আধা-সামন্তবাদী প্রথা-পদ্ধতিতে শাসিত বাংলাদেশের ন্যায় অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সরকারী শিক্ষাদান পদ্ধতি যতটা না জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করে তার চেয়ে অনেক বেশী সহায়তা করে stupid অর্থাৎ শিক্ষিত মূর্খ তৈরীর মেশিনরূপে।

বাংলাদেশের নামটা যখন এসে গেছে তখন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি বিষয়ে কিছুটা আলোচনা এখানেই করে নেয়া যাক। দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র, শিক্ষক এবং অনুরাগীরা বিশ্বনাগরিক। কেননা দর্শনশাস্ত্র সহ এ-যুগের সকল শাস্ত্রই যুগপৎ বিশ্বজনীন এবং স্থানিক। সুতরাং বৃহত্তর পরিসরে জ্ঞান চর্চার সময়ে স্বদেশের প্রতি উদাসীন থাকলে কর্তব্য কর্মে অবহেলা করা হয় বলেই আমার ধারণা, কেননা বিশ্বজনীনতার প্রভাব স্বদেশের সামাজিক জীবনে যদি না পড়ে তা'হলে জ্ঞানচর্চা সেকালের মতো একালেও একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

এ-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যা সহ সকল শাখার সর্বাধুনিক বিদ্যা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনলজি মানবজাতিকে দিয়েছে ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ী, জাহাজ, বিমানযান, পারমাণবিক রি-এক্ট্যর, নানা ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র, উৎক্ষেপন যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদে অবতরণের ক্ষমতা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিভিশন এবং সর্বোপরি বিশাল বিশাল কল-কারখানায় যে কোনো দ্রব্য লাখে লাখে প্রস্তুত এবং পৃথিবীর সর্বত্র অল্প সময়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করার যোগ্যতা। কম্প্যুটর এখন মানব-মস্তিষ্কের বহু জটিল প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব দিচ্ছে। ঢাকায় বসে মেক্সিকোর খেলা দেখছি। রাডার বহু দূরের দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। বিশাল বিশাল মুদ্রণযন্ত্রে শতাধিক পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু ঘন্টায় বিশ ত্রিশ হাজার করে ছাপা হচ্ছে। দর্শনশাস্ত্রও এখন আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব, পাভলভের প্রতিবর্তী-ক্রিয়া তত্ত্ব (theory of conditioned reflex), জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, উচ্চতর গণিত, পরমাণু-বিভাজনকৌশল, সমাজ-বিজ্ঞান, এমন কি বাইওলজি ফিজিওলজির সঙ্গেও মিশে গেছে। বলা বাহুল্য, এসব কিছুই মানুষের আবিষ্কার: কোনো কিছু সহসা উল্কা পিণ্ড পতিত হওয়ার মতো আকাশ হতে ভূমণ্ডলে পতিত হয় নি। বিজ্ঞান এবং টেকনলজির এ-অসাধারণ উন্নতির ফলে সুদূরও হয়ে গেছে অত্যন্ত নিকট—বিশ্ব আজ ওয়েনডেল উইলকির এক বিশ্ব। নারী-পুরুষ জাতি ধর্ম রং নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ এই একীভূত বিশ্বের সকল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক সম্পৃক্ত। পৃথিবীতে আজ মাত্র দুটি আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সিস্টেম বিদ্যমান। তার একটি পঁজিবাদী পদ্ধতি। অন্যটি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি। দু'টি পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্যাদর্শের লড়াই আছে: কিন্তু শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগের লেনদেনের জটিল জালের বাইরে আলাদাভাবে অবস্থান করার উপায় কারো নেই। অপরদিকে কোনো জাতি দেশ বা রাষ্ট্রের সাধ্য নেই উক্ত দু'টি পদ্ধতির বাইরে অবস্থান করার।

এগুলো আমার মনগড়া কথা নয়: সবার চোখের সামনেই আছে। কিন্তু বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী এবং পুরোহিত শ্রেণী বলছে, ইসলাম ধর্ম না কি complete code of life—অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধি। এ উক্তিকে আমরা দু'দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। প্রথমতঃ পারলৌকিক চিন্তা, দৈনন্দিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, সৎ অসৎ কার্যাবলী সব কিছুই ইহজগতে করণীয়—পরলোকে সদাচরণ অসদাচরণ, নীতি-দুর্নীতি, পাপপুণ্য, আইন-কানুন, ধর্মাধর্ম, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই নেই। ইসলাম ধর্মমতে আছে শুধু অন্তহীন বেহেশত এবং দোজখ। সুতরং ইহলোকে যখন যে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সিস্টেম প্রচলিত তার মধ্যে অবস্থান করেই জীবিত মানুষকে তার ধর্মকর্ম করতে হয়। এর বাইরে থাকার কোনো উপায় নেই। এমন কি, পরলোকের বেহেশত দোজখের যে বিবরণ আমরা পাই সে-তো ধর্মপ্রবর্তিত হওয়ার স্থানে প্রচলিত সমকালীন পরম সুখ এবং চরম শাস্তি সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণারই প্রতিলিপি।

দ্বিতীয়ত, শাসকশ্রেণী এদ্বং পুরোহিতন্ত্র প্রচারিত তের চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বের complete code of life এর মধ্যে রেলগাড়ী, স্টীমার, মোটরগাড়ী, বিমানযান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র, ডুবোজাহাজ, বিদ্যুৎশক্তি, গ্যাস, টেলিফোন, টেলেক্স, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, অসাধারণ গতিদানক্ষম উৎক্ষেপণ যন্ত্র, বন্দুক কামান, ইনকাম ট্যাক্স, সুপার ট্যাক্স, মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত আঠাল এ-যুগের সরকারী যন্ত্র ও ব্যুরোক্রাসি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী লেনদেনে সুদ আদান প্রদানের বাধ্যবাধকতা, কোম্পানিজ 'ল', কমার্শিয়াল কোর্ট প্রভৃতি কিছুই ছিল না। ছিল না অসংখ্য প্রকার ভোজ্য ও ভোগ্য পণ্য, লাখ লাখ লোকের বিশাল বিশাল মহানগর, অগণিত বড় বড় সুউচ্চ দালান কোঠা, তার এসকেলেটর, লিফট, ব্যাঙ্ক-ইন্সিউরেন্স কোম্পানি, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন প্রভৃতি কিছুই। ভূগর্ভে খনি ছিল কিন্তু ভূপৃষ্ঠে খনিজ তৈল ছিল না। এসব কিছু নিয়েই এ যুগের complete code of life। বলা বাহুল্য, code of life কখনও complete অর্থাৎ ফাইনা-লাটিতে পৌঁছার নয় : তার মধ্যে ক্রমাগত যোগ বিয়োগের ক্রিয়া চলছে। এ-প্রক্রিয়াতেই এগিয়ে চলছে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এ যুগের রাষ্ট্রে কোটি কোটি লোক বসবাস করে। অতি সৎ এবং পরম মানবহিতৈষী রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষেও এ-যুগে বাড়ী বাড়ী ঘুরে অধিবাসীদের সুখ-দুঃখের খোঁজ খবর নেয়া এবং অভুক্তের বাড়ীতে নিজ মাথায় বহন করে আটা বা চালের বস্তা পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়। সে-কালের complete code of life এর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী যান হিসেবে আমরা উট, ঘোড়া এবং পাল চালিত জাহাজের উল্লেখ দেখতে পাই। নেজা, গুরজু, ঢাল, তরবারি, কুঠার, প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোনো মারণাস্ত্রেরও উল্লেখ দেখতে পাই না। তখন সূর্য ঘুরতো, পৃথিবী ছিল স্থির এবং চ্যাপটা—চলতে চলতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এখন সূর্যও ঘোরে বটে, কিন্তু পৃথিবীও সূর্যের চারদিকে ঘোরে বলেই দিন রাত হয়—ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। মানুষের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ, চাঁদের মতো পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এবং সেই উপগ্রহের সহায়তায় আমরা দেশদেশান্তরের তথ্য আদান প্রদান করি। সকল একেশ্বরবাদীর কাছে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। উপরিউক্ত বস্তু এবং বিষয়গুলো বিষয়ে ঈশ্বর অবগত থেকেও কেন চৌদ্দ শ'ত বছর পূর্বে তিনি মানবজাতিকে এ-সব জ্ঞান দিলেন না এমন কি তার উল্লেখও করলেন না কোথাও—এ-প্রশ্ন মানব মনে জাগা স্বাভাবিক। আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহভাজন সম্প্রদায় বলে বিশ্বাস করি। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ আমরা জামাতে বসে মোনাজাত করি, হে আল্লাহ আমাদের ইজ্জত বৃদ্ধি করো, কাফেরদের জিল্লতি বৃদ্ধি করো এবং ওদের বাড়ীঘর ধূলিসাৎ করে দাও—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ফলাফল কি? চর্মচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি, আমরা যাদের কাফের বলি তারাই এখন ইসলামের আদিভূমি আরব সহ সমগ্র ইসলাম জগতের উপর আধিপত্য করছে। মুসলমানদের প্রথম কাবা বায়তুল মোকাদ্দেস এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াহুদীর দখলে। কাফেরদের বাড়ীঘর ক্রমাগত মজবুত এবং সুন্দর হচ্ছে। এসব নিদর্শন বা আয়াত কি এ ইঙ্গিতই দেয় না যে, মানুষকে নিজের চেষ্টায়ই যার যার ভাষার সহায়তায় জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করতে হয়। ঈশ্বর কাউকে আগাম জ্ঞান দান করেন না। এবং ব্যৈক্তিক বা সাম্প্রদায়িক প্রার্থনাও ঈশ্বরকে প্রভাবিত করতে পারে না। কেননা ধর্মমতানুযায়ী তিনি শুধু সর্বভূতেশ্বর নহেন, মহাবিশ্বের সব কিছুর ঈশ্বর। এটাও একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, মক্কা মদীনার বাইরের দেশ বিজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম রাজা বাদশাহ-গণকে রোমান অথবা ইরানীদের রাজ্য শাসন প্রণালী গ্রহণ করতে হয়। ধর্মগ্রন্থে কিছু কিছু ফৌজদারী দেওয়ানী আইন আছে। ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আইনের প্রায় সবকিছুই প্রাচীন বেবিলনীয় রাজা হাম্বুরাবি হতে মুসা হয়ে আগত। এমন কি বাড়তি ত্বকচ্ছেদ, খাদ্যাখাদ্য ও বিবাহ সম্পর্কিত বিধি নিষেধ এবং সুদ আদান প্রদান সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতিও। এটাকেই আমি বলতে চাই বহমান আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার তথা ঐতিহাসিক বাধ্য-বাধকতা। এই বাধ্যবাধকতার বাইরে থাকার উপায় যেমন নেই; তেমনি সমকালীন অবস্থার মধ্যেই পরবর্তী ঐতিহাসিক অধ্যায়ের বীজ উপ্ত থাকে। কেননা বলপ্রয়োগে সাধিত বিপ্লবই হোক আর ক্রমান্বয়ে সাধিত পরিবর্তনই হোক মানবেতিহাস চিন্তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে : কোনো বিশেষ কালকে যেমন আলাদা করে বিচার বিশ্লেষণ করা যায় না তেমনি কোনো একটি সামাজিক সমস্যাও তার অন্য সমস্যাবলী হতে পৃথক করে সমাধান করা সম্ভব নয়। স্থানে স্থানে বাধা বিপত্তি এমন কি সময়ে পশ্চাদ্ধাবন সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে মানবেতিহাসের প্রতিটি যুগ-প্রবর্তক পরবর্তী অধ্যায় মানবজাতির অগ্রগতি ও উন্নতির ইতিহাস। মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী ও বিমানযান, বিজলীবাতি, টেলিফোন, টেলিভিশন, আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতি ছেড়ে যেমন উষ্ট্র, অশ্ব, গরুর গাড়ী, পিদিমের নিবু নিবু আলো, সেলাইহীন লুঙ্গি চাদর, খেজুর, উষ্ট্রদুগ্ধ ও উষ্ট্রমাংসের যুগে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় এ যুগের দু'টি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সিস্টেম পুঁজিবাদ অথবা সমাজতন্ত্রের বাইরে অবস্থান করা। তের চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বের complete code of life-এ ফিরে যাওয়ার অর্থ উষ্ট্র, অশ্ব, গরুর গাড়ী, পিদিমের আলো, চোখের বদলে চোখ, ক্রী মানুষের বদলে ক্রী মানুষ, দাসদাসীর বদলে দাসদাসী, দাসত্ব-প্রথা প্রভৃতিতে ফিরে যাওয়া। এক মুখে এক সময়ে দুধ ও তামাক সেবন সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মীয় ও দার্শনিক সিস্টেম উদ্ভাবক ও প্রবর্তকগণ ছিলেন যার যার কালে বিদ্রোহী। যীশুখৃস্ট তো বিদ্রোহী হিসেবেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ সহ মুসলিম অধ্যুষিত সকল দেশের মুসলিম রাজনীতিক এবং ওদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী তথাকথিত ওলামায়ে কেরাম এ-সব জানেন এবং জীবন যাপনও করছেন এ-যুগের code of life অনুযায়ী। ওরা টেলিফোন টেলেক্স করছেন, রেলগাড়ী মোটরগাড়ী, বিমান প্রভৃতিতে চড়ছেন, পীড়িত হলে এ্যান্টিবায়টিক ঔষধও ব্যবহার করছেন, কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ আগত দৃশ্যাবলী রঙীন টেলিভিশনে দেখছেন, মাইক যন্ত্রের মাধ্যমে ওয়াজনসীহত করছেন, আজান দিচ্ছেন, বক্তৃতা করছেন, রেডিয়োতে গান শুনছেন, প্রয়োজন-বোধে বন্দুক কামান বোমারু বিমান প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র স্বদেশের মানুষের উপর প্রয়োগ করছেন, এ-যুগের যাবতীয় খাদ্যাখাদ্য পানীয় ও পোশাক পরিচ্ছদ দেশে বিদেশে ভোজন, পান ও ব্যবহার করছেন, বিজলী বাতির সাহায্যে ঘর আলোকিত করছেন, ব্যবসা বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় লেনদেনে সুদ আদান প্রদান করছেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে। ক্রীতদাস ক্রীতদাসী রাখার জায়েজ প্রথাটিও বর্জন করেছেন। হাম্মুরাবী হতে মুসা হয়ে আগত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের অনেক কিছু বর্জন এবং সংশোধন করেছেন। এখানে এ-কথাটি বলে রাখা আবশ্যক যে বর্তমান যুগের উপরিউক্ত অপরিহার্য দ্রব্যগুলোর কোনো একটিও পৃথিবীর কোনো একজন মুসলমান আবিষ্কার করেন নি। প্রকৃতপক্ষে পুত্র কর্তৃক নিহত মির্জা উলুগ বেগের পরে পৃথিবীর কোথাও নামোল্লেখ করার মতো কোনো মুসলিম বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এমন কি কবি সাহিত্যিকের সন্ধান পাওয়া যায় না। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত একমাত্র মুসলিম আবদুস সালাম। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী তাঁকে অমুসলমান ঘোষণা করেছে। বাঙালী মুসলিম সমাজের প্রায় আটশত বছরের ইতিহাসে একমাত্র অসামান্য প্রতিভাবান ব্যক্তি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁকেও কাফের ঘোষণা করা হয়েছিল। বেদীন কাফেরদের আবিষ্কৃত এবং তাদের কাছ থেকে নগদ দাম দিয়ে ক্রীত যানবাহন, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহারী মুসলিম শাসকশ্রেণী এবং ওদের সহযোগী তথাকথিত ওলামায়ে কেরাম তবু সাধারণ মানুষকে এই বলে বেড়াচ্ছেন যে, তের চৌদ্দ শতাব্দীপূর্বের complete code of life-এর পশ্চাদ্ধাবনের মধ্যেই না কি এ-যুগের বাংলাদেশের দশ কোটি মানুষের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত। শিক্ষার নামে, বক্তৃতায়, ওয়াজ নসীহতে, পাঠ্য-পুস্তকে, স্কুল মাদ্রাসায় মূর্খতা এবং গোমরাহি সম্প্র-সারণের এই যে অবিরাম চেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধে বিদগ্ধ মহলের—দেশের দার্শনিক, দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র, পদার্থ-বিজ্ঞানী, রসায়নশাস্ত্রী, এবং গাণিতজ্ঞদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কোথায়? মূর্খতা এবং গোমরাহি সম্প্রসারণোপযোগী সিলেবাস, কারিকুলাম, বইপত্র প্রভৃতি তো আর নিরক্ষর সাধারণ মানুষ প্রণয়ন করে না। সাধারণ মূর্খ মানুষ শিক্ষকতাও করছে না। বিদ্বান ব্যক্তি যখন বিদ্যা বিতরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না করে গোমরাহি এবং মূর্খতা সম্প্রসারণকারী ভণ্ডদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তখন তাকে চাণক্য বা মেকিয়াভেলির সঙ্গে আসন দিলেও সে লোক দুটোর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। সব কিছু দেখে শুনে মনে হয়, মুসলিম সমাজ হতে লজ্জাও লজ্জিতবোধ করে পালিয়ে গেছে।

মানবতাবাদ বলতে আমি বুঝি মানব কল্যাণ। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রথাপদ্ধতি সংশোধিত, বিবর্তিত এবং বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে মানব-কল্যাণ সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণাও রদবদল হয়েছে। এ্যারিস্টটলের মধ্যে গণতন্ত্রের কথাও আছে। কিন্তু দাসদাসীরা সচেতন মানুষরূপে গণ্য নয়। সুতরাং তাদের কল্যাণ-চিন্তা সেখানে নেই। ইসলাম ধর্মেও দাসত্ব প্রথা, মানুষ-কেনা-বেচার প্রথা, যুদ্ধে বন্দী শত্রুপক্ষের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে মালে গণীমতরূপে দাস-দাসীতে পরিণত করার প্রথা বহাল রয়েছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেয়া, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ভালো কাজ। কিন্তু এ-দয়া-দাক্ষিণ্য স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং মানব-কল্যাণ চিন্তার ক্ষেত্রে এটা মৌলিক পরিবর্তন নয়। রাজা-বাদশা ও ধনী ব্যক্তিগণ পালা পার্বণ বা বিশেষ কোনো উপলক্ষে যে দান-খয়রাত করেন, সেটা-তো প্রকৃত পক্ষে যে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পদ্ধতি একটি বিশেষ শ্রেণীকে অবিরত ধন মান যশ এবং ক্ষমতা প্রদান করে এবং বাকী বৃহত্তর জনসাধারণকে অবিরত গরীব হতে অধিকতর গরীব, নিরক্ষর এবং ভিক্ষুকে পরিণত করে সেই পদ্ধতি চিরস্থায়ী করারই কৌশল মাত্র: জুতো মেরে নমস্কার করার শামিল। philanthrophy-র মধ্যে মানব-কল্যাণবোধ থাকতে পারে—বিশেষ অবস্থাধীনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হিতৈষণামূলক প্রতিষ্ঠানের মূল্যও হয়তো আছে কিন্তু কোনটাই মানব-কল্যাণের স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। রবার্ট আওয়েন, আলবার্ট সোয়েটজার প্রমুখ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, রকফেলার ফাউণ্ডেশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত খাদ্য-লিল্লাহ, ক্ষুদ্র পরিসরে আমাদের দেশের কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট প্রভৃতি জাতীয় অসংখ্য হিতৈষণামূলক প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের দুঃখ দুর্দশা ঘোচেনি: একদিকে চলছে সংখ্যালঘু শ্রেণীর অতিমাত্রায় ভোগ-বিলাসী জীবন এবং অপরদিকে চলছে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মূর্খতা, ভিক্ষাবৃত্তি, যাযাবর বৃত্তি, বেকারত্ব প্রভৃতি। এ অবস্থার মধ্যে যারা মনে করেন মানুষের ভালোমানুষী অর্থাৎ স্বেচ্ছামূলক উদ্যোগে সাম্য মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্ব ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে—একদিকে বিলাস-ব্যসন এবং অপর দিকে প্রকট দারিদ্র থাকবে না, তাদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ না করেও বলা যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সমাজ-বিজ্ঞানী নহেন। তারা রোমান্টিক, তারা টমাস মোর কল্পিত ইয়োটপিয়াবাসী। রবার্ট আওয়েনের মতো ইমানদার এবং নিষ্ঠাবান মানব-হিতৈষীরাও তাই ইয়োটপিয়ান সোসালিস্ট। বৃটেন এবং আমেরিকা দু'জায়গাই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। রিকার্ডো, আওয়েন প্রমুখের আর্থ-রাজনৈতিক মতামত দর্শন খেতাব পায়নি। রোমান্টিক কবিতা আছে, কিন্তু রোমান্টিক দর্শন হয় না। রোমান্টিক সাধারণতঃ অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে দার্শনিকের পদ্ধতি সমাজের উপর প্রয়োগ করা হয়। তাই সমাজবিজ্ঞানী না হয়ে দার্শনিক হওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত কার্ল মার্কস। তিনি যুগপৎ সমাজ-বিজ্ঞানী, অর্থ-শাস্ত্রবিদ এবং দার্শনিক। তাঁর পদ্ধতি আজ পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক গ্রহণ করেছে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে অতি মাত্রায় রোমান্টিকদের গুণ হচ্ছে, "proneness to emotion and more particularly to the emotion of sympathy. To be throughly satisfactory, the emotion must be direct and violent and quite uninformed by thought. The man of sensibility would be moved to tears by the sight of a single destitute peasant family, but would be cold to well thought out schemes for ameliorating the lot of peasant as a class," আসলে এই শ্রেণীচিন্তাই বড় কথা এবং সকল প্রকার সামাজিক দর্শন চিন্তার মূলে সেকালে একালে সকলকালেই ক্রিয়া করেছে শ্রেণীচিন্তা। তিনতলা দালানের উপরের প্রশস্ত বারান্দায় বসে নীচে সহসা কোনো দুস্থরুগ্ন ব্যক্তি কেন এমন কি একটা রুগ্ন কুকুর দেখলেও দর্শক বড়লোকটির মনে দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রবল ভাবাবেগ জাগতে পারে; কিন্তু তিনি যখন ক্ষমতাবান শাসক শ্রেণীর একজনরূপে রাষ্ট্রীয় নীতি নিরূপণ এবং "উন্নয়ন পরিকল্পনা" প্রণয়ন করেন তখন দেখা যায় তার নীতি এবং পরিকল্পনা রচিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তার স্বশ্রেণীভুক্ত ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের আরো অধিক ধনী ও ক্ষমতাশালী এবং বুভুক্ষু দরিদ্র শ্রেণীকে আরো অধিক বুভুক্ষু ও দরিদ্র করার বিশেষ উদ্দেশ্যে।

বাংলাদেশে এখন এ-ক্রিয়াই চলছে। মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে প্রহসন। মূলে প্রবেশ না করে এ-প্লেগের চিকিৎসা অর্থাৎ মানব কল্যাণ-সাধন সম্ভব নয়। মানব কল্যাণের অর্থ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পদ্ধতি পরিবর্তন ব্যতীত এ-যুগে মানবকল্যাণ সাধন অসম্ভব। বাংলাদেশের মতো স্বল্পায়তন জনবহুল প্রাকৃতিক সম্পদহীন দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে হলে সমাজতান্ত্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি গ্রহণ অপরিহার্য মনে করি। যাদের কথা এবং ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে মিল নেই তারা জানপাপী ভণ্ড মোনাফিক। ভণ্ড মোনাফিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা-কারী পণ্ডিত ব্যক্তিরা আর যাই হউন ইমানদারও নন দার্শনিকও নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~